সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১২২

১৫শ প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৫
বৈশাখ	১৪১১
এপ্রিল	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

تحریک اسلامی کے اخلاقی بنیادی-এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI ANDOLANER NAITIK BHITTI by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 10.00 Only.

"ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি" বইটি ১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠান কোটস্থ দারুল ইসলামে মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর একটি বক্তৃতা।

এ বইটিতে নৈতিকতার মূল ভিত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিধায় বইটি আমরা আবারও প্রকাশ করলাম। এর দ্বারা পাঠকগণ উপকৃত হলে আশা আছে আখেরাতে আমরাও কিছু উপকৃত হব।

—প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনারা জানেন, আমাদের ইসলামী আন্দোলনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন। এই দুনিয়াতে আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই, তা এই যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্র হতে ফাসেক, আল্লাহদ্রোহী ও পাপীষ্ঠ লোকদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে আমরা সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করব। এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করাকে আমরা ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই আল্লাহর সন্তোষলাভের একমাত্র উপায় বলে বিশ্বাস করি।

কিন্তু আমরা যে জিনিসকে নিজেদের চরম উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি, বর্তমান মুসলিম অমুসলিম—কেউই এর গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন ও অবহিত নয়। মুসলমানগণ একে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাত্র বলে মনে করে। দ্বীন ইসলামে এর গুরুত্ব যে কতখানি, তা তারা মাত্র অনুধাবন করতে সমর্থ হয় না। অমুসলিমগণ কিছুটা হিংসার বশবর্তী এবং অনেকটা অজ্ঞতাবশত মানব সমাজের মূলগত সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই অচেতন হয়ে আছে। এই দুনিয়ায় মানব সমাজের সকল দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মুসিবতের মূলীভূত কারণ হচ্ছে মানুষের উপর ফাসেক—আল্লাহদ্রোহী পাপী ও অসৎলোকদের নেতৃত্ব। পৃথিবীর সর্বাধিক কাজকর্মের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র সৎ ও আল্লাহর অনুগত লোকদের হাতে ন্যস্ত হওয়ার উপরই মানবতার কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এই কথা মাত্রই হৃদয়ংগম করতে পারছে না। আজ বিশ্বের মানব সমাজে যে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, অত্যাচার-জুলুম ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের স্বপ্লাবী সয়লাব বয়ে চলছে, মানব চরিত্রে যে সর্বাত্মক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, মানবীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিষ সংক্রমিত হয়েছে, পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপাদান এবং মানব বুদ্ধির আবিষ্কৃত সমগ্র শক্তি ও যন্ত্র যেভাবে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের পরিবর্তে ধ্বংস সাধনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে—এসবের জন্য মানব সমাজের বর্তমান নেতৃত্বই যে একমাত্র দায়ী, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। দুনিয়াতে সৎ ও সত্য প্রিয় লোকদের কোন অভাব নেই—একথা ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মের কর্তৃত্ব এবং সমাজযন্ত্রের কোন চাবিকাঠি তাদের হাতে নয়, এ-ই স্বতঃসিদ্ধ। বরং বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্রই কর্তৃত্ব রয়েছে আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহবিমুখ,

জড়বাদী ও নৈতিক চরিত্রহীন লোকদের মুষ্ঠিতে। এমতাবস্থায় যদি কেউ দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং বিপর্যয়, উচ্ছৃংখলা, অশান্তি, অসচ্চরিত্রতা এবং অন্যায়কে পরিবর্তিত করে শান্তি-শৃংখলা এবং সুসংবদ্ধতা-সচ্চরিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়, তবে পূণ্য ও সওয়াবের ওয়াজ, আল্লাহর বন্দেগী করার সদুপদেশ, সচ্চরিত্রতা, নির্মল নৈতিকতা গ্রহণের মৌখিক উৎসাহ দেয়াই কখনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। বরং মনুষ্য জাতির মধ্যে সত্য প্রিয়তা ও ন্যায়পন্থী যত লোকই পাওয়া যাবে, তাদের একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে সমষ্টিগত শক্তি অর্জন করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ফাসেক ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের হাত হতে কেড়ে সত্যপন্থী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করাই সংস্কারবাদী প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

মানব জীবনের জটিল সমস্যাবলী সম্পর্কে সামান্য মাত্র জ্ঞানও যার আছে, এই নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সে ভাল করেই অবহিত হবে যে, মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও চাবিকাঠি কার হাতে নিবদ্ধ—এই প্রশ্নের উপরই মানব জীবনের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং ভাঙন-বিপর্যয় ও অধপতন একান্তভাবে নির্ভর করে। গাড়ী যেমন সবসময়ই সেই দিকেই দৌড়িয়ে থাকে যেদিকে তার পরিচালক—ড্রাইভার চালিয়ে নেয় এবং তার আরোহীগণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক—সেই দিকেই ভ্রমণ করতে বাধ্য হয় ; অনুরূপভাবে মানব সমাজের গাড়ীও ঠিক সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে থাকে যেদিকে তার নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা নিয়ে যায়। পৃথিবীর সমগ্র উপায়-উপাদান যাদের করায়ত্ব হয়ে থাকবে ; শক্তি, ক্ষমতা, ইখতিয়ারের সব চাবিকাঠি যাদের মুঠির মধ্যে থাকবে, সাধারণ জনগণের জীবন যাদের হাতে নিবদ্ধ হবে, চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শের রূপায়ণ-বাস্তবায়নের জন্যে অপরিহার্য উপায়-উপাদান যাদের অর্জিত হবে, ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র পুনর্গঠন, সমষ্টিগত নীতি-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং নৈতিক মূল্য (Value) নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের রয়েছে, তাদের অধীন জীবনযাপনকারী লোকগণ সমষ্টিগতভাবে তার বিপরীত দিকে কিছুতেই চলতে পারে না। এই নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকগণ—যদি আল্লাহর অনুগামী, সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয়, তবে সেই সমাজের লোকদের জীবনের সমগ্র গ্রন্থী ও ব্যবস্থাই আল্লাহভীতি, সার্বিক কল্যাণ ও ব্যাপক সত্যের উপর গড়ে উঠবে। অসৎ ও পাপী লোকও সেখানে সৎ ও পুণ্যবান হতে বাধ্য হবে। কল্যাণ ও সৎ ব্যবস্থা এবং মঙ্গলকর রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎকর্ষ

ও বিকাশ লাভ করবে। অন্যায় এবং পাপ নিঃশেষে মিটে না গেলেও অন্তত তা উন্নতিশীল এবং বিকশিত হতে পারবে না। কিন্তু নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি আল্লাহদ্রোহী, ফাসেক, পাপী ও পাপলিপ্সু লোকদের করায়ত্ত হয়, তবে গোটা জীবনব্যবস্থায়ই স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহ দ্রোহিতা জুলুম, অন্যায়, অনাচার ও অসচ্চরিত্রতার পথে চলতে শুরু করবে। চিন্তাধারা আদর্শ ও মতবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প ও রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক কাজকর্ম বিচার ও আইন–সমষ্টিগতভাবে এ সবকিছুই বিপর্যস্ত হবে। অন্যায় ও পাপ ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। কল্যাণ, ন্যায় ও সত্য পৃথিবীর কোথাও একবিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবী ন্যায় ও সত্যকে স্থান দিতে, বায়ু ও পানি তার লালন-পালন করতে অস্বীকার করবে। আল্লাহর এই পৃথিবী অত্যাচার জুলুম, শোষণ ও নিপীড়ন-নিষ্পেষণের সয়লাব স্রোতে কানায় কানায় ভরে যাবে। এরূপ পরিবেশে অন্যায়ের পথে চলা সকলের পক্ষেই সহজ হবে—ন্যায় ও সত্যের পথে চলা-চল নয় শুধু দাঁড়িয়ে থাকাও হবে অত্যন্ত কঠিন। একটি জনাকীর্ণ মিছিলের সমগ্র জনতা যেদিকে চলে সেদিকে চলার জন্য উক্ত মিছিলের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ শক্তি ব্যয় করতে হয় না, ভিড়ের চাপেই সে স্বতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, কিন্তু তার বিপরীত দিকে চলার জন্য প্রবল শক্তি ব্যয় করে এক কদম পরিমাণ স্থান অগ্রসর হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় বিপরীত দিকে সামান্য চললেও ভিড়ের প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য চাপে দশ কদম পশ্চাতে সরে পড়তে বাধ্য হয়—এটা এক স্বতসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত সত্য। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ধারা যখন অসৎ ও পাপাশ্রয়ী লোকদের নেতৃত্ব কুফরী ও ফাসেকী পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন (উপরোক্ত উদাহরণের ন্যায়) স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের পক্ষে অন্যায়ের পথে চলা তো খুবই সহজ—এতই সহজ হয় যে, সেদিকে চলার জন্য নিজের কোন শক্তি ব্যয় করতেই হয় না—কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলতে চাইলে নিজের দেহ-মনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেও তার পক্ষে ন্যায় পথে দৃঢ় হয়ে থাকতে পারলেও সমষ্টিগতভাবে তার জীবন মানব সমষ্টির অনিবার্য চাপে পাপ ও অন্যায়ের পথেই চলতে বাধ্য হয়।

এখানে আমি যা বলছি তা এমন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, যার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যক হতে পারে। বাস্তব ঘটনা প্রবাহই একে অনস্বীকার্য সত্যে পরিণত করেছে। কোন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এর সত্যতা স্বীকার না করে পারে না। এই বইয়ের প্রত্যেক পাঠকই আমার উক্ত কথার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। বিগত এক শতাব্দীকালের মধ্যে

আমাদের এই দেশের লোকদের মতবাদ, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী, রুচি ও স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সভ্যতা ও চরিত্রের মানদণ্ড এবং মূল্য ও গুরুত্বের মাপকাঠি বদলে গেছে। আমাদের একটি জিনিসও অপরিবর্তিত থাকতে পারেনি। এই বিরাট পরিবর্তন আমাদের এই দেশে আমাদেরই দৃষ্টির সম্মুখে সাধিত হলো। মূলত এর কি কারণ হতে পারে, তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন ? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এর একটি মাত্র কারণ রয়েছে আর আপনিও যতই চিন্তা করেন, এছাড়া অন্য কোন কারণ নির্ধারণ করা আপনার পক্ষেও সম্ভব হবে না। সে কারণ শুধু এটাই যে, যেসব লোকের হাতে এদেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিবদ্ধ ছিল—সমাজ পরিচালন ও দেশ শাসনের ক্ষমতা-ইখতিয়ার যাদের করায়ত্ত ছিল, তারাই সমগ্র দেশের নৈতিক চারিত্র, মনোবৃত্তি, মনস্তত্ত্ব, কাজকর্ম ও পারস্পরিক লেন-দেন ও আদান-প্রদান এবং সমাজ-সংস্থা ও ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারেই ঢেলে গঠন করেছিলো। এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করার জন্য যেসব শক্তি মস্তক উত্তোলন করেছিল, তারা কতখানি সাফল্য লাভ করতে পেরেছে, আর ব্যর্থতা তাদেরকে কতখানি অভিনন্দিত করেছে, তাও একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। একথা কি সত্য নয় যে, পরিবর্তন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দান করেছেন, তাঁদেরই সন্তান অধস্তন পুরুষ শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন স্রোতের গড্ডালিকা প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে গেছে ? বহির্বিশ্বের যাবতীয় বিবর্তিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও ধরন-পদ্ধতি সবকিছুই তাদের ঘরবাড়ী নিমজ্জিত করে দিয়েছে ? এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে যে, অসংখ্য সম্মানিত ধর্ম নেতার বংশে আজ এমনসব লোকের জন্ম হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং অহী ও নবুয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ পোষণ করছে ? জাতীয় জীবনের এই বিরাট বিপর্যয় এই বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পরও কি একথা অস্বীকার করা যায় যে, মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে নেতৃত্বের সমস্যাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর সত্য কথা এই যে, এই জিনিসটির এহেন গুরুত্ব কেবল বর্তমানেই তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি, এটা এক চিরন্তন সত্য ও চিরকালীন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। الناس على دين ملوكهم "জনগণ নেতৃবৃন্দেরই আদর্শানুসারী হয়ে থাকে" কথাটি বহু পুরাতন। হাদীস শরীফে জাতীয় উত্থান-পতন, গঠন ও ভাঙনের জন্য দায়ী করা হয়েছে জাতিসমূহের আলেম, পণ্ডিত, শিক্ষিত লোক এবং নেতৃবৃন্দকে। কারণ, সমাজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব চিরদিনই এদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে।"

সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য

সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দ্বীন ইসলামে যে কতবেশী গুরুত্বপূর্ণ, তা উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারা যায়। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ এই যে, দুনিয়ার সকল মানুষ নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহর দাস হয়ে জীবনযাপন করবে এবং তাদের গলায় আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের শৃঙ্খল থাকবে না। সেই সঙ্গেই এর আর একটি দাবী এই যে, আল্লাহর দেয়া আইনকেই মানুষের জীবনের একমাত্র আইন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর তৃতীয় দাবী এই যে, পৃথিবীর বুক হতে সকল অশান্তি ও বিপর্যয় নির্মূল করতে হবে, পাপ ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে হবে। যেহেতু দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ।

অতএব এসব দূরীভূত করে তদস্থলে ন্যায়, সত্য, কল্যাণ ও মংগলকর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা এটাই পসন্দ করেন এবং ভালবাসেন। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারেন যে, মনুষ্য জাতির নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং যাবতীয় সামাজিক কার্যাবলীর মূল চাবিকাঠি যতদিন কাফের ও ভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকবে ; আর একমাত্র সত্য ব্যবস্থা —ইসলামের অনুসারী যতদিন তাদের অধীন, তাদেরই প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগে লিপ্ত হয়ে ঘরের কোণে বসে আল্লাহর 'জিকর' করার কাজে নিমগ্ন হয়ে থাকবে ততদিন উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারে না। এই লক্ষ্য স্বতই নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন দাবী করে এবং সকল ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পন্থী, আল্লাহর সন্তোষকামী লোকদেরকে পরস্পর মিলিত হয়ে সামগ্রিক শক্তি অর্জন করতে এবং সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র সত্য বিধান ইসলামকে কায়েম করতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়। এই সত্য বিধান কায়েম করতে হলে নেতৃত্বের পদ ও কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক ঈমানদার, সৎ ও আদর্শবাদী লোকের হাতে অর্পণ করতে হবে। এরূপ রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন ছাড়া দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য এবং দাবী কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের সত্য বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি এই বিরাট কর্তব্য বিস্মৃত হওয়ার পর এমন কোন কাজই থাকতে পারে না, যা করে আল্লাহর কিছুমাত্র সন্তোষলাভ করা সম্ভব হতে পারে। কুরআন মজীদে জামায়াতবদ্ধ হওয়া ও নেতার আদেশ শ্রবণ ও পালনের উপর এতবেশী গুরুত্ব কেন আরোপ করা হয়েছে, তা বাস্তবিকই প্রনিধানযোগ্য। উপরন্তু কুরআনের বিধান মত জামায়াত হতে স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত ব্যক্তি হত্যার যোগ্য—তাওহীদের

কালেমায়ে তার বিশ্বাস থাকলেও এবং নামায-রোযা পালনকারী হলেও এই দণ্ড হতে সে কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারে না। এরই বা কারণ কি ? এর মূলীভূত ও একমাত্র কারণ কি এই নয় যে, সৎ নেতৃত্ব ও সত্যের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি সাধন দ্বীন ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলেই এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে ? আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সমষ্টিগত ও সংঘবদ্ধ শক্তি অর্জন করা একান্তই অপরিহার্য। কাজেই যে ব্যক্তিই সামগ্রিক শক্তি ও সামাজিক শৃংখলা চূর্ণ করবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার অপরাধ এতবড় ও এত মারাত্মক যে হাজার তাওহীদ স্বীকার এবং হাজার নামায-রোযা দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ কিছুতেই হতে পারে না।

পরন্তু, ইসলামে জিহাদের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন, তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জিহাদ হতে বিরত থাকলে কুরআন মজিদ তাকে 'মুনাফিক' বলে কেন অভিহিত করে ? কারণ এই যে, জিহাদ ইসলামের সত্য বিধান প্রতিষ্ঠারই নামান্তর মাত্র, কুরআন শরীফে মুসলমানের ঈমান পরীক্ষার জন্য এই জিহাদকেই চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কথায় কুরআনের বিধান অনুযায়ী ঈমানদার ব্যক্তি বাতিল ও কাফেরী শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্যে কখনই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর দ্বীন ইসলামের সত্য ও আদর্শ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা না করা এবং জান-মালের কুরবানী না দেয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর এই কাজে এই ব্যাপারে কারো কুণ্ঠা ও ইতস্ততভাব প্রকাশিত হলে তার ঈমান সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে অন্য হাজার 'সওয়াবের' কাজও তাকে কোন কল্যাণদান করতে সমর্থ হয় না।

এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করার স্থান এটা নয়, এখানে তার অবকাশও নেই ; কিন্তু উপরে যা কিছু বলেছি তা হতে খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা একটি কেন্দ্রীয় ও মৌলিক উদ্দেশ্য বিশেষ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই ইসলামের প্রতি যার ঈমান আছে একমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই যথাসম্ভব ইসলামী আদর্শের অনুসারী করলে তার সকল কর্তব্য সম্পন্ন হয় না—তার সকল দায়িত্ব পালন হয় না। মানব সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার কাফের ও ফাসেকদের নিকট হতে কেড়ে নিয়ে সর্বাপেক্ষা সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী লোকদের হাতে উহা তুলে দেয়ার জন্য সকল শক্তি নিযুক্ত করাও তার মূল ঈমানের ঐকান্তিক ও অনস্বীকার্য দাবী। কারণ, আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও সমাজ পরিচালনা এরূপ এক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আদৌ সম্ভব নয়।

পরন্তু, এই উদ্দেশ্য যেহেতু উচ্চতর সামগ্রিক প্রচেষ্টা ছাড়া হাসিল হতে পারে না, এজন্যই এমন একটি সৎ ও আদর্শ জামায়াত গঠন করাও অপরিহার্য যা সবসময়েই ইসলামের সত্য নীতি অনুসরণ করে চলবে এবং ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, স্থায়ী রাখা এবং তাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করে যাওয়া ভিন্ন তার আর কোনই উদ্দেশ্য হবে না। সারা পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক যদি ঈমানদার হয়, তবুও সে একাকী বলে এবং নিজেকে নিঃসম্বল মনে করে বাতিল শাসনব্যবস্থার প্রভাব সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কিংবা اهون البليتين। —'দু'টি বিপদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতম বিপদকে গ্রহণ করার' অবাঞ্ছিত কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কুফরী ও ফাসেকী ব্যবস্থার অধীন নামেমাত্র ধর্মীয় জীবনযাপন করার সুবিধা ভোগ করা তার পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। বরং সেই একাকী ও নিঃসংগ ঈমানদার ব্যক্তিরও কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বমানবকে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান গ্রহণ করার আহবান জানান। তার এই আহবানের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করলেও সমগ্র জীবন ভর ইসলামের সত্য ও দৃঢ় পথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং লোকদেরকে আহবান জানান ও আহবান জানাতে জানাতেই মৃত্যু মুখে ঢলে পড়া তার কর্তব্য। নিজ মুখে সত্যভ্রষ্ট দুনিয়ার পসন্দসই কোন আমন্ত্রণ প্রচার করা এবং কাফেরদের নেতৃত্বের অধীন দুনিয়া যে পথে ছুটে চলেছে, সেই দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা সত্য পথে সত্যের বাণী প্রচার করতে করতে মৃত্যুবরণ করাও তার পক্ষে শ্রেয়। আর তার আমন্ত্রণে কিছু সংখ্যক লোক যদি একত্রিত হয়, তাদের নিয়ে একটি বিশেষ সংঘ গঠন করা এবং উল্লেখিত আদর্শের জন্য সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলন করাই তার একান্ত কর্তব্য।

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে এবং কুরআন ও হাদীস নিগূঢ়ভাবে অধ্যয়নের ফলে যতটুকু বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি আমি লাভ করতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে আমি এটাকেই দ্বীন ইসলামের মৌলিক দাবী বলে জানতে পেরেছি। আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ এটাই আমাদের নিকট দাবী করে বলে বুঝতে পেরেছি, আর আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীর এটাই যে সুন্নাত ছিল তা আমি নিসন্দেহে জানতে পেরেছি। আমি আমার এ মত ত্যাগ করতে মাত্রই রাজি নই—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কুরআন ও সুন্নাহর দলিল হতেই আমার ভুল প্রমাণ করে দিবে।

নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম

আমাদের এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য বুঝে নেয়ার পর এই ব্যাপারে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার 'নিজস্ব নিয়ম-নীতি কি—তাও জেনে নেয়া

আবশ্যক। কারণ, আমাদের কোন উদ্দেশ্য লাভ করতে হলে তা আল্লাহর নিয়ম অনুসারেই লাভ করা সম্ভব, তার বিপরীত নয়। আমরা যে বিশ্ব প্রকৃতির বুকে বসবাস করি, আল্লাহ্ তাঁর একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীই এটা সৃষ্টি করেছেন। এখানকার প্রত্যেকটি দ্রব্য ও বস্তুই সেই স্থায়ী ও অটল নিয়ম বিধানের অনুসারী। কেবল সদিচ্ছা ও নেক বাসনার দরুনই এখানে চেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারে না। মহান পবিত্র আত্মাদের (?) বরকতেই এখানে কোন বাসনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। এই প্রাকৃতিক দুনিয়ায় মানুষের চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়ার আল্লাহ নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলা অপরিহার্য। একজন কৃষক—সে যতবড় বুজুর্গ হোক, মহৎ গুণের আধার এবং তসবীহ পাঠে যতই আত্মহারা হোক না কেন—যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরিপূর্ণ শ্রম সহকারে কৃষিকাজ সম্পন্ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার একটি বীজও অংকুরিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে নেতৃত্ব বিপ্লবের সেই চরম উদ্দেশ্যও কখনো কেবল দোয়া, তাবীজ, সদিচ্ছা ও নেক বাসনার সাহায্যে লাভ করা যাবে না। রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, দুনিয়ায় নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। এরই অধীন একজন লোক নেতৃত্ব লাভ করে এবং এ নিয়ম অনুযায়ীই এক একজন লোক নেতৃত্ব হারায় বা নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়। এই সম্পর্কে আমার অন্যান্য রচনাবলীতেও আমি আলোচনা করেছি বটে ; কিন্তু তা ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আজ এখানে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মনে করি। কারণ, এই বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পরিষ্কার ধারণা না হলে আমাদের কর্মপন্থা এবং চলার পথ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে না।

মানুষের গোটা সত্তার বিশ্লেষণ করে দেখলে নিসন্দেহে জানতে পারা যায় যে, এর মধ্যে দু'টি দিক পরস্পর বিরোধী হয়েও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মানুষের একটি দিক এই যে, তার একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ও পাশবিক সত্তা রয়েছে। তার এই সত্তার উপর ঠিক সেইসব নিয়ম ও আইন জারী হয়ে আছে, যা সমগ্র বস্তুগত ও জন্তু-জানোয়ারের উপর বর্তমান। দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র জড় পদার্থ ও জান্তব সত্তার কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতা যেসব যন্ত্রপাতি ও বৈষয়িক উপায়-উপাদান এবং জড় অবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীল, মানুষের এই দিকটির কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতাও অনুরূপভাবে সেই সবেরই উপর নির্ভরশীল। মানুষের এই স্বাভাবিক (Physical) সত্তা তার যাবতীয় কর্মক্ষমতাকে একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপাদানের সাহায্যে এবং স্বাভাবিক জড় অবস্থায় থেকেই ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই

তার সকল কাজের উপরই বাস্তব ও কার্যকারণ পরম্পরা জগতের সমগ্র শক্তিই বিপরীত কিংবা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মানুষের মধ্যে আর একটি দিক রয়েছে খুবই উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে তার মানবিক দিক—তার মানুষ হওয়ার দিক অন্য কথায় বলা যায়, মানুষের একটি নৈতিক দিক রয়েছে, যা কোনদিক দিয়েই প্রাকৃতিক সত্তার অধীন ও অনুসারী নয়। এই নৈতিক দিক—নৈতিক সত্তাই মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক দিকের উপর—এক হিসেবে প্রভুত্ব বিস্তার করে। স্বাভাবিক ও জান্তব সত্তাকেও এটা অস্ত্র ও উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের কার্যকারণসমূহকেও নিজের অধীন করতে এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে যেসব নৈতিক ও চারিত্রিক গুণপণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাই হচ্ছে এর কর্মচারী বা কার্যসম্পন্নকারী শক্তি। তার উপর প্রাকৃতিক নিয়মের কোন প্রভুত্বই চলে না, চলে নৈতিক নিয়ম বিধানের প্রভুত্ব।

মানুষের উত্থান-পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল

উল্লেখিত দু'টি দিক মানুষের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং তার উত্থান ও পতন বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিক—এই উভয়বিধ শক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। মানুষ না বস্তুনিষ্ঠ শক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে, আর না নৈতিক শক্তির মুখাপেক্ষীহীন হয়ে কিছু সময় বাঁচতে পারে। তার উন্নতি লাভ হলে উভয় শক্তির ভিত্তিতেই হবে, আর পতন হলেও ঠিক তখনি হবে, যখন এই উভয়বিধ শক্তি হতেই সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অথবা এটা অন্যান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে নিসন্দেহে বুঝতে পারা যাবে যে, মানব জীবনের মূল সিদ্ধান্তকারী গুরুত্ব রয়েছে নৈতিক শক্তির—বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তির নয়। বৈষয়িক বস্তুনিষ্ঠ উপায়-উপাদান লাভ, স্বাভাবিক পন্থাসমূহের ব্যবহার এবং বাহ্যিক কার্যকারণ পরম্পরাসমূহের আনুকূল্য সাফল্যলাভের জন্য অপরিহার্য শর্ত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজেই মানুষ যতদিন এই কার্যকারণ পরম্পরা জগতে বসবাস করবে, এই শর্ত কোনরূপেই উপেক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে মূল জিনিসটি মানুষের পতন ঘটায়, উত্থান দান করে এবং তার ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে যে জিনিসটির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব রয়েছে, তা একমাত্র নৈতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষকে এর দেহসত্তা বা এর পাশবিক দিকটার জন্য কখনও মানুষ বলে অভিহিত করা হয় না, বরং

মানুষকে মানুষ বলা হয় এর নৈতিক গুণ-গরিমার কারণে। মানুষের একটি দেহ আছে, স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে, তা কতখানি স্থান দখল করে থাকে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, কিংবা বংশ বৃদ্ধি করে ; কিন্তু শুধু এই কারণে মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য বস্তু ও জন্তু হতে স্বতন্ত্র মর্যাদালাভের অধিকারী হতে পারে না। মানুষ নৈতিক গুণসম্পন্ন জীব, তার নৈতিক স্বাধীনতা ও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। ঠিক এই জন্যই মানুষকে দুনিয়ার সমগ্র জীব-জন্তু ও বস্তুর উপর বিশিষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মানুষকে 'দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খলীফা' হওয়ার মহান মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব মানবতার মূল প্রাণবস্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন মানুষের নৈতিকতা, তখন মানুষের জীবনে গঠন-ভাঙ্গন ও উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী গুরুত্বও যে সেই নৈতিক চরিত্রেই রয়েছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত মানুষের উত্থান-পতনের উপর তার নৈতিক নিয়ম-বিধানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

এই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার পর আমরা যখন নৈতিক চরিত্রের গভীরতর বিশ্লেষণ করি, তখন নীতিগতভাবে এর দু'টি প্রধান দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়—একটি হচ্ছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র, অপরটি হচ্ছে ইসলামী নৈতিক চরিত্র।

মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ

মৌলিক মানবীয় চরিত্র বলতে বুঝায় সেসব গুণবৈশিষ্ট্য যার উপর মানুষের নৈতিক সত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। দুনিয়ার মানুষের সাফল্যলাভের জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণ-গরিমাই এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কোন সৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করুক, কি ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যে—সকল অবস্থায় তা একান্তই অপরিহার্য। মানুষ আল্লাহ, অহী, রাসূল এবং পরকাল বিশ্বাস করে কি করে না, তার হৃদয় কলুষমুক্ত কিনা, নিয়ত ও লক্ষ্য কল্যাণময় কিনা, সে নিজে সৎ গুণ ও সৎকাজে ভূষিত কিনা, সদুদ্দেশ্যে কাজ করে, অসুদুদ্দেশ্যে—উল্লেখিত চরিত্রের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কারো মধ্যে ঈমান থাকুক কি না থাকুক, তাদের জীবন পবিত্র হোক কি অপবিত্র, তার চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্য সৎ হোক কি অসৎ—এসব প্রশ্নের উর্ধে থেকে পার্থিব জগতে সাফল্যলাভের জন্য অপরিহার্য গুণগুলো কেউ আয়ত্ত করলেই সে নিশ্চিন্তরূপে সাফল্যমন্ডিত হবে এবং ঐসব গুণের দিক দিয়ে যারা পশ্চাদপদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা প্রথম ব্যক্তির পশ্চাতে পড়ে থাকবে।

ঈমানদার, কাফের, নেককার, বদকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপর্যয়কারী প্রভৃতি যে যাই হোক না কেন, তার মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল ব্যগ্রতা, উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনা, বীরত্ব ও বীর্যবত্তা, সহনশীলতা ও পরিশ্রম প্রিয়তা, উদ্দেশ্যের আকর্ষণ এবং সে জন্য সবকিছুরই উৎসর্গ করার প্রবণতা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি যাচাই করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে ঢেলে গঠন করা ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা নিজের হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা বাসনা, স্বপ্ন সাধ ও উত্তেজনার সংযমশক্তি এবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা ও তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করার দুর্বার বিচক্ষণতা যদি কারো মধ্যে পুরোপুরিভাবে বর্তমান থাকে, তবে এই দুনিয়ায় তার জয় সুনিশ্চিত।

সেই সঙ্গে এমন গুণও কিছু না কিছু থাকা অপরিহার্য, যা মনুষ্যত্বের মূল—যাকে সৌজন্য ও ভদ্রতামূলক স্বভাব-প্রকৃতি বলা যায় এরই দৌলতে এক একজন লোকের সম্মান-মর্যাদা, মানব সমাজে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আত্মসম্মান জ্ঞান, বদান্যতা দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, ঔদার্য ও হৃদয়মনের প্রসারতা, বিশালতা, দৃষ্টির উদারতা, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, ওয়াদাপূর্ণ করা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা, ভব্যতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং মন ও আত্মার সংযম শক্তি প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কোন জাতির বা মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলীর সমাবেশ হয়, তবে মানবতার প্রকৃত মূলধনই তার অর্জিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ সংস্থা গঠন করা তার পক্ষে অতীব সহজসাধ্য হবে। কিন্তু এই মূলধন সমাবিষ্ট হয়ে কার্যত একটি সুদৃঢ় ও ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক রূপলাভ করতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সাথে আরো কিছু নৈতিক গুণ এসে মিলিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজের সমগ্র কিংবা অধিকাংশ মানুষই একটি সামগ্রিক লক্ষ্যকে নিজেদের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করবে। সেই লক্ষ্যকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ—এমনকি, নিজের ধন-প্রাণ ও সম্পদ-সন্তান হতেও অধিক ভালবাসবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব প্রবল হবে, তাদের মধ্যে পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার মনোভাব থাকবে। সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার জন্য যতখানি আত্মদান অপরিহার্য, তা করতে তারা প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকবে। ভাল ও মন্দ নেতার মধ্যে পার্থক্য করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা তাদের থাকতে হবে—যেন যোগ্যতম ব্যক্তি তাদের

নেতা নিযুক্ত হতে পারে। তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অপরিসীম দূরদৃষ্টি ও গভীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং এছাড়া নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অন্যান্য গুণাবলীও বর্তমান থাকা দরকার। সমাজের সকল লোককে নিজেদের নেতৃবৃন্দের আদেশ পালন ও অনুগমনে অভ্যস্থ হতে হবে। তাদের উপর জনগণের বিপুল আস্থা থাকতে হবে এবং নেতৃবৃন্দের নির্দেশে নিজেদের সমগ্র হৃদয়, মন, দেহের শক্তি এবং যাবতীয় বৈষয়িক উপায়-উপাদান লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার জন্য যে কোন কাজে জনমত প্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকবে শুধু তা-ই নয়, গোটা জাতির সামগ্রিক জনমত এত সজাগ-সচেতন ও তীব্র হতে হবে যে সামগ্রিক কল্যাণের বিপরীত ক্ষতিকারক কোন জিনিসকেই নিজেদের মধ্যে এক মুহূর্তের তরেও টিকতে দেবে না।

বস্তুত এগুলোই হচ্ছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র। এগুলোকে আমি "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" বলে এজন্য অভিহিত করেছি যে, মূলত এ নৈতিক গুণগুলোই হচ্ছে মানুষের নৈতিক শক্তি ও প্রতিভার মূল উৎস। মানুষের মধ্যে এই গুণাবলীর তীব্র প্রভাব বিদ্যমান না থাকলে কোন উদ্দেশ্যের জন্যই কোন সার্থক সাধনা করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। এই গুণগুলোকে ইস্পাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইস্পাতের মধ্যে দৃঢ়তা, অক্ষয়তা ও তীব্রতা রয়েছে, এরই সাহায্যে একটি হাতিয়ার অধিকতর শাণিত ও কার্যকরী হতে পারে। অতপর তা ন্যায় কাজে ব্যবহৃত হবে কি অন্যায় কাজে—সে প্রশ্ন অপ্রাসংগিক। যার সৎ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সে জন্য কাজ করতে চাহে, ইস্পাত নির্মিত অস্ত্রই তার জন্য বিশেষ উপকারী হতে পারে, পচা কাঠ নির্মিত অস্ত্র নয়। কারণ, আঘাত সহ্য করার মত কোন ক্ষমতাই তাতে নেই। ঠিক এই কথাটি নবী করীম (সা) হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন ঃ

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ

—"তোমাদের মধ্যে ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের উত্তম লোকগণ ইসলামী যুগেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে।"

অর্থাৎ জাহেলী যুগে যাদের মধ্যে যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ কর্মক্ষমতা এবং প্রতিভা বর্তমান ছিল ইসলামের মধ্যে এসে তারাই যোগ্যতম কর্মী প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাদের কর্মক্ষমতা উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পূর্বে তাদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা ভুল পথে ব্যবহার হতো, এখন ইসলাম তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু অকর্মণ্য ও হীনবীর্য লোক না জাহেলিয়াতের যুগে কোন কার্যসম্পাদন করতে পেরেছে না ইসলামের কোন বৃহত্তম খেদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয়েছে। আরব দেশে নবী করীমের

(সা) যে বিরাট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ হয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব সিন্ধু নদ হতে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত—দুনিয়ার একটি বিরাট অংশের উপর বিস্তারিত হয়েছিল তার মূল কারণ এটাই ছিল যে, আরব দেশের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ তাঁর আদর্শানুগামী হয়েছিল। তাদের মধ্যে উক্ত রূপ চরিত্রের বিরাট শক্তি নিহিত ছিল। মনে করা যেতে পারে, আরবের অকর্মণ্য, অপদার্থ, বীর্যহীন, ইচ্ছাশক্তি বিবর্জিত, বিশ্বাস-অযোগ্য লোকদের একটি বিরাট ভিড় যদি নবী করীমের (সা) চারপাশে জমায়েত হতো, তবে অনুরূপ ফল কখনোই লাভ করা সম্ভব হতো না। একথা একেবারেই স্বতসিদ্ধ।

ইসলামী নৈতিকতা

নৈতিক চরিত্রের দ্বিতীয় প্রকার—যাকে আমি "ইসলামী নৈতিকতা" বলে অভিহিত করেছি—এ সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে। মূলত এটা মৌলিক মানবীয় চরিত্র হতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কোন জিনিস নয়, বরং তার বিশুদ্ধকারী ও পরিপূরক মাত্র।

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সঠিক ও নির্ভুল কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়। অতপর এটা সম্পূর্ণ রূপে কল্যাণকর ও মঙ্গলময়ে পরিণত হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুনিরপেক্ষ নিছক একটি শক্তি মাত্র। এই অবস্থায় তা ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কল্যাণকরও হতে পারে, অকল্যাণের হাতিয়ারও হতে পারে। যেমন, একখানি তরবারি একটি তীর শাণিত অস্ত্র মাত্র। এটা একটি দস্যুর মুষ্টিবদ্ধ হলে যুলুম-পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হবে। আর আল্লাহর পথে জিহাদকারীর হাতে পড়ে এটা হতে পারে সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের নিয়ামক। অনুরূপভাবে "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" কারো মধ্যে শুধু বর্তমান থাকাই তার কল্যাণকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নৈতিক শক্তি সঠিক পথে নিয়োজিত হওয়ার উপরই তা একান্তভাবে নির্ভর করে। ইসলাম একে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে মাত্র। ইসলামের তাওহীদী দাওয়াতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। এই দাওয়াত গ্রহণকারী লোকদের পার্থিব জীবনের সমগ্র চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম মেহনতকে আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্যই নিয়োজিত হতে হবে। وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ "হে আল্লাহ ! আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা এবং সকল দুঃখ ও শ্রম স্বীকারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমার সন্তোষ লাভে।" ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের সকল তৎপরতা আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ

হবে। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ "হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমার জন্য আমরা নামায ও সিজদায় ভূলুণ্ঠিত হই।"

ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ও অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয়কে এভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। এই মৌলিক সংশোধনের ফলে উপরোল্লিখিত সকল বুনিয়াদী মানবীয় চরিত্রই সঠিক পথে নিযুক্ত ও পরিচালিত হয় এবং তা ব্যক্তিস্বার্থ, বংশ পরিবার কিংবা জাতি ও দেশের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্য অযথা ব্যয়িত না হয়ে একান্তভাবেই সত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্যই সংগতরূপে ব্যয় হতে থাকে। এর ফলেই তা একটি নিছক শক্তি মাত্র হতে উন্নীত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কল্যাণ ও রহমাতের বিরাট উৎসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সুদৃঢ় করে দেয় এবং চরম প্রান্তসীমা পর্যন্ত এর ক্ষেত্র ও পরিধি সম্প্রসারিত করে। উদাহরণ স্বরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তির মধ্যেও যে ধৈর্য ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়, তা যদি নিছক বৈষয়িক স্বার্থের জন্য হয় এবং শিরক ও বস্তুবাদী চিন্তার মূল হতে 'রস' গ্রহণ করে, তবে তার একটি সীমা আছে, যে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। অতপর উহা কেঁপে উঠে, নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ধৈর্য ও তিতিক্ষা তাওহীদের উৎসমূল হতে 'রস' গ্রহণ করে এবং যা পার্থিব স্বার্থলাভের জন্য নয়—একান্তভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত—তা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার এক অতল স্পর্শ মহাসাগরে পরিণত হবে। দুনিয়ার সমগ্র দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত মিলিত হয়েও তাকে শূন্য ও শুষ্ক করতে সমর্থ হয় না। এজন্যই 'অমুসলিম'দের ধৈর্য খুবই সংকীর্ণ ও নগণ্য হয়ে থাকে। যুদ্ধের মাঠে তারা হয়ত গোলাগুলির প্রবল আক্রমণের সামনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ আসা মাত্রই কামাতুর বৃত্তির সামান্য উত্তেজনার আঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বিস্তারিত করে দেয় এবং সামান্য ও নির্দিষ্ট কয়েকটি দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত প্রতিরোধের ব্যাপারেই নয়, সকল প্রকার লোভ-লালসা, ভয়, আতঙ্ক ও আশংকা এবং প্রত্যেকটি পাশবিক বৃত্তির মোকাবিলায় স্থিতিলাভের জন্য এটা একটি বিরাট শক্তির কাজ করে। বস্তুত ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনকে একটি অচল-অটল ধৈর্যপূর্ণ পর্বত প্রায় সহিষ্ণু জীবনে পরিণত করে। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সঠিক পন্থা অবলম্বন করাই হয় এহেন ইসলামী জীবনের মূলনীতি তাতে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি-লোকসান

বরদাশত করতে হলেও এই জীবনে এর কোন 'সুফল' পাওয়া না গেলেও জীবনের গতি ধারায় একবিন্দু পরিমাণ বক্রতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এই জীবন কোনরূপ স্খলন বরদাশত করতে পারে না। অভাবিত পূর্ব সুযোগ-সুবিধা লাভ, উন্নতি এবং আশা-ভরসার শ্যামল-সবুজ বাগিচা দেখতে পেলেও নয়। পরকালের নিশ্চিত সুফলের সন্দেহাতীত আশায় দুনিয়ার সমগ্র জীবনে অন্যায় ও পাপ হতে বিরত থাকা এবং পুণ্য, মঙ্গল ও কল্যাণের পথে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়ারই নাম হচ্ছে ইসলামী সহিষ্ণুতা —ইসলামী সবর। পরন্তু, কাফেরদের জীবনের খুব সংকীর্ণতম পরিবেশের মধ্যে ততধিক সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ী সহিষ্ণুতার যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, মুসলমানদের জীবনে তাও অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হবে। এই উদাহরণের ভিত্তিতে অন্যান্য সমগ্র মৌলিক মানবীয় চরিত্র সম্পর্কেও ধারণা করা যেতে পারে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভুল চিন্তা ও আদর্শ ভিত্তিক না হওয়ার দরুন কাফেরদের জীবন কত দুর্বল এবং সংকীর্ণ হয়ে থাকে তাও নিসন্দেহে অনুধাবন করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম সেইসবকে বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু ভিত্তিতে স্থাপিত করে অধিকতর মজবুত এবং বিস্তৃত ও বিশাল অর্থদান করে।

তৃতীয়ত, ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের উপর মহান উন্নত নৈতিকতার একটি অতি জাঁকজমকপূর্ণ পর্যায় রচনা করে দেয়। এর ফলে মানুষ সৌজন্য ও মাহাত্ম্যের এক চূড়ান্ত ও উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করে থাকে। ইসলাম মানুষের হৃদয়মনকে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, অত্যাচার, নির্লজ্জতা ও অসংলগ্নতা উশৃঙ্খলতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে দেয় এবং তাতে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র ও সচেতন করে তোলে। আত্মসংযমে তাকে সর্বতোভাবে অভ্যস্ত নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকে দয়াবান, সৌজন্যশীল, অনুগ্রহ সম্পন্ন, সহানুভূতিপূর্ণ, বিশ্বাসভাজন, স্বার্থহীন, সদিচ্ছাপূর্ণ, নিষ্কলুষ নির্মল ও নিরপেক্ষ, সুবিচারক এবং সর্বক্ষণের জন্য সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় করে দেয়। তার মধ্যে এমন এক উচ্চ পবিত্র প্রকৃতি লালিত-পালিত হতে থাকে, যার নিকট সবসময় মঙ্গলেরই আশা করা যেতে পারে—অন্যায় এবং পাপের কোন আশংকা তার দিক হতে থাকতে পারে না। উপরন্তু, ইসলাম মানুষকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে সৎ বানিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না —তা যথেষ্টও মনে করে না। রাসূলের বাণী অনুযায়ী তাকে ঃ مفتاح للخير ومغلاق لشر কল্যাণের দ্বার উৎঘাটন এবং অকল্যাণের পথ রোধকারীও' বানিয়ে দেয়। অন্য কথায় গঠনমূলক দৃষ্টিতে ইসলাম তার উপর ন্যায়ের প্রচার

ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটনের বিরাট কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পণ করে। এরূপ স্বভাব-প্রকৃতি লাভ করতে পারলে এবং কার্যত ইসলামের বিরাট মহান মিশনের জন্য সাধনা করলে এর সর্বাত্মক বিজয়াভিযানের মোকাবিলা করা কোন পার্থিব শক্তিরই সাধ্যায়ত্ত হবে না।

নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতির সারকথা

দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দানের ব্যাপারে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতেই আল্লাহ তায়ালার একটি স্থায়ী নিয়ম ও রীতি চলে এসেছে এবং মানব জাতি বর্তমান প্রকৃতির উপর যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তা একই ধারায় জারী থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে প্রসংগত সেই নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক কার্যকারণ ও জড় উপায়-উপাদান প্রয়োগকারী কোন সুসংগঠিত দল যখন বর্তমান থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এমন একটি দলের হাতে ন্যস্ত করেন যে দল অন্তত মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক উপায়-উপাদানসমূহ ব্যবহার করার দিক দিয়ে অন্যান্যের তুলনায় অধিকতর অগ্রসর। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই পৃথিবীর শৃংখলাবিধান করতে দৃঢ় সংকল্প। এই শৃংখলাবিধানের দায়িত্ব ঠিক সেই মানব গোষ্ঠীকেই দান করেন, যারা সমসাময়িক দলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম প্রমাণিত হবে। বস্তুত দুনিয়ার নেতৃত্বদান সম্পর্কে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার স্থায়ী নীতি।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সুসংগঠিত দল যদি বাস্তবিকই বর্তমান থাকে, যা ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয় দিক দিয়েই অবশিষ্ট সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট প্রমাণিত হবে এবং জাগতিক উপায়-উপাদান ও জড় শক্তি প্রয়োগেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হবে না, তবে তখন পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কোন দলের হাতে অর্পিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। শুধু অসম্ভবই নয় তা অস্বাভাবিকও বটে, তা মানুষের জন্য নির্ধারিত আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম-নীতিরও সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ তায়ালা সত্যপন্থী ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের জন্য তাঁর কিতাবে যে প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছেন, এটা তারও খেলাফ হয়ে পড়ে। দুনিয়ার বুকে সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পন্থী, আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী বিশ্বপরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন একটি একনিষ্ঠ মানব দল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি দুনিয়ার কর্তৃত্ব তার

হাতে অর্পণ না করে কাফের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের হাতে ন্যস্ত করবেন—একথা কিরূপে ধারণা করা যেতে পারে ?

কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ অনিবার্য পরিণাম ঠিক তখনি লাভ করা যেতে পারে যখন উল্লেখিত গুণাবলী সমন্বিত একটি দল বাস্তবিকই দুনিয়াতে বর্তমান থাকবে। এক ব্যক্তির সৎ হওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সৎ ব্যক্তির বর্তমান থাকায় দুনিয়ার নেতৃত্বলাভের আল্লাহর নীতিতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে পারে না—সেই ব্যক্তিগণ যতবড় অলী আল্লাহ পয়গম্বরই হোক না কেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেতৃত্বদানের যে ওয়াদা করেছেন, তা বিক্ষিপ্ত ও অসংঘবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে নয় ; এমন একটি দলকে এটা দান করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন যা কার্যত ও বাস্তব ক্ষেত্রে নিজেকে خَيْرَ أُمَّةٍ "সর্বোত্তম জাতি" ও أُمَّةً وَسَطًا "মধ্যম পন্থানুসারী জাতি" বলে প্রমাণ করতে পারবে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, উক্তরূপ গুণে ভূষিত একটি দলের শুধু বর্তমান থাকাই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়, তা এমন নয় যে, এদিকে এরূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করবে, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করে ফাসেক-কাফেরদেরকে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের গদি হতে বিচ্যুত করে দিবে এবং এই দলকে তদস্থলে আসীন করবে। এরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানব সমাজে কখনই কোন পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না। নেতৃত্বের ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে, প্রত্যেক কদমে পদক্ষেপে কাফের ও ফাসেকী শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব ও প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করতে হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সকল প্রকার কুরবানী দিয়ে নিজের সত্যপ্রীতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিজের অপ্রতিভ যোগ্যতাও প্রমাণ করতে হবে। বস্তুত এটা এমন একটি অনিবার্য শর্ত যা নবীদের উপরও প্রযোজ্য হয়েছে। অন্য কারো এই শর্ত পূরণ না করে সমাজ নেতৃত্বে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নৈতিক শক্তির তারতম্য

জাগতিক জড়শক্তি এবং নৈতিক শক্তির তারতম্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের গভীরতর অধ্যয়নের পর আল্লাহর এই সুন্নাত বা রীতি আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেখানে নৈতিক শক্তি বলতে কেবল মাত্র মৌলিক মানবীয় চরিত্রই হবে, সেখানে জাগতিক উপায়-উপাদান ও জড়শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি, একটি বৈষয়িক জড়শক্তি যদি বিপুল পরিমাণে বর্তমান থাকে তবে

সামান্য নৈতিক শক্তির সাহায্যেই সে সারাটি দুনিয়া গ্রাস করতে পারে। আর অপর দল নৈতিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর হয়েও কেবলমাত্র বৈষয়িক শক্তির অভাব হেতু সে পশ্চাৎপদ হয়ে থাকবে। কিন্তু যেখানে নৈতিক শক্তি বলতে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয়ের প্রবল শক্তির সমন্বয় হবে, সেখানে বৈষয়িক জড়শক্তির সাংঘাতিক পরিমাণে অভাব হলেও নৈতিক শক্তিই জয়লাভ করবে এবং নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক জড়শক্তির ভিত্তিতে যে শক্তিসমূহ মস্তক উত্তোলন করবে তা নিশ্চিতরূপেই পরাজিত হবে। সুস্পষ্টরূপে বুঝার জন্য একটি হিসেবের অবতারণা করা যেতে পারে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সাথে যদি একশত ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি অপরিহার্য হয় তবে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রের পূর্ণ সমন্বয় হওয়ার পর মাত্র ২৫ ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি উদ্দেশ্য লাভের জন্য যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ জড়শক্তির অভাব কেবল ইসলামী নৈতিকতাই পূরণ করে দেবে। উপরন্তু নবী করীমের (সা) জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় যে, রসূলে করীম (সা) এবং তার আসহাবদের সমপরিমাণ ইসলামী নৈতিকতা হতে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ জড়শক্তিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে ঃ

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

—"তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন পরম ধৈর্যশীল লোক হয় তবে তারা দু'শ'জনের উপর জয়ী হতে পারবে।"

এই শেষোক্ত কথাটিকে নিছক 'অন্ধভক্তি ভিত্তিক ধারণা' মনে করা ভুল হবে। আর আমি যেকোন মো'জেযা বা কেরামতির কথা বলছি, তাও মনে করবেন না। বস্তুত এটা এক বাস্তব এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা সন্দেহ নেই। এই সত্য তত্ত্ব কার্যকারণ পরম্পরা অনুযায়ী এই দুনিয়াতেই পরিস্ফুট হয় —সকল সময় এটা পরিস্ফুট হতে পারে। এর কারণ যদি বর্তমান থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই বাস্তবে রূপায়িত হবে।

কিন্তু ইসলামী নৈতিকতা—যার মধ্যে মৌলিক মানবীয় চরিত্রও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে—বৈষয়িক জড়শক্তির শতকরা ৭৫ ভাগ বরং ৫০ ভাগ অভাব কিরূপে পূরণ করে ; তা একটি নিগূঢ় রহস্য বটে। কাজেই সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এর বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই রহস্য হৃদয়ংগম করার জন্য সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট। বিগত মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাপান ও জার্মানীর পরাজয় ঘটে। মৌলিক মানবীয়

চরিত্রের দিক দিয়ে এই বিপর্যয়ের সংশ্লিষ্ট উভয় দলই প্রায় সমান। বরং সত্য কথা এই যে, কোন দিক দিয়ে জার্মান ও জাপান মিত্র পক্ষের মোকাবিলায় অধিকতর মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রমাণও উপস্থিত করেছে। জড়বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং এর বাস্তব প্রয়োজনের ব্যাপারেও উভয় পক্ষই সমান ছিল। বরং সত্য কথা এই যে, এই ক্ষেত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন বিদিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেবল একটি ব্যাপারেই এক পক্ষ অপর পক্ষ হতে অনেকটা অগ্রসর—আর তা হচ্ছে বৈষয়িক কার্যকারণের আনুকূল্য। এই জনশক্তির অপরাপর সকল পক্ষ অপেক্ষাই অনেকগুণ বেশী। বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান তার সর্বাপেক্ষা অধিক রয়েছে। এর ভৌগলিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ঐতিহাসিক কার্যকারণ অপরাপর পক্ষের তুলনায় বহুগুণ বেশী অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করে নিয়েছিল। ঠিক এজন্য মিত্রপক্ষ বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়। আর এজন্যই যে জাতির জনসংখ্যা অপর্যাপ্ত, বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান যার নিকট কম, তার পক্ষে অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত ও বিপল জাগতিক উপায়-উপাদান বিশিষ্ট জাতির মোকাবিলায় মস্তকোত্তলন করে দণ্ডায়মান হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও জড়বিজ্ঞান ব্যবহারের দিক দিয়ে খুব বেশী অগ্রসর হলেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ মৌলিক মানবীয় চরিত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উত্থিত জাতি হয় জাতীয়তাবাদী হবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশও অধিকার করতে প্রয়াসী হবে, নতুবা তা এক সার্বজনীন আদর্শ ও নিয়ম বিধানের সমর্থক হবে এবং তা গ্রহণ করার জন্য দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহকেও আহ্বান জানাবে। সে জাতির এ দু'টির যে কোন এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে। প্রথম অবস্থা হলো বৈষয়িক জড়শক্তি ও জাগতিক উপায়-উপাদানের দিক দিয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর হওয়া ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার দ্বিতীয় কোন পন্থা আদৌ থাকতে পারে না। এর কারণ এই যে, যেসব জাতিকে সে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা লিপ্সার অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে কৃত সংকল্প হয়েছে তারা অত্যন্ত তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে তার প্রতিরোধ করবে এবং তার পথরোধ করতে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করবে। কাজেই তখন আক্রমণকারী জাতির পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু উক্ত জাতির যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয়—যদি উহা কোন সার্বজনীন আদর্শের নিশান বরদার হয়, ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তখন জাতিকে প্রতিবন্ধকতার পথ হতে অপসৃত করতে খুব বেশী শক্তি প্রয়োগ করার আবশ্যক হবে না। কিন্তু এখানে ভুললে চলবে না যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি মনোমুগ্ধকর নীতি-আদর্শই কখনো মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত করতে পারে না। সে জন্য সত্যিকার

সদিচ্ছা, সহানুভূতি, হিতাকাঙ্খা, সততা, সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থতা, উদারতা, বদান্যতা, সৌজন্য ও ভদ্রতা এবং নিরপেক্ষ সুবিচার নীতি একান্ত অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এই মহৎ গুণগুলোকে যুদ্ধ-সন্ধি, জয়-পরাজয়, বন্ধুতা-শত্রুতা এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কঠিন পরীক্ষায় অত্যন্ত খাঁটি অকৃত্রিম ও নিষ্কলুষ প্রমাণিত হতে হবে। কিন্তু এরূপ ভাবধারার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে উন্নত চরিত্রের উচ্চতম ধাপের সাথে এবং তার স্থান মৌলিক মানবীয় চরিত্রের অনেক উর্ধে। ঠিক এ কারণেই নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক শক্তির ভিত্তিতে উত্থিত জাতি প্রকাশ্যভাবে জাতীয়তাবাদীই হোক কি গোপন জাতীয়তাবাদের সাথে কিছুটা সার্বজনীন আদর্শের প্রচার ও সমর্থন করার ছদ্মবেশই ধারণ করুক—একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণীগত অথবা জাতীয় স্বার্থ লাভ করাই হয় তার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময় আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে ঠিক এই ভাবধারাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধরনের যুদ্ধ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি জাতি প্রতিপক্ষের সামনে এক দুর্জয় দুর্গের ন্যায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তার প্রতিরোধে স্বীয় সমগ্র নৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি প্রয়োগ করে। তখন আক্রমণকারী জাতির শ্রেষ্ঠতর জড়শক্তির আক্রমণে শত্রু পক্ষকে সে নিজ দেশের চতুর্সীমার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে দিবে না।

কিন্তু এই সময় এরূপ পরিবেশের মধ্যে এমন একটা মানবগোষ্ঠী যদি বর্তমান থাকে প্রথমত তা একটি জাতির লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকলেও কোন দোষ নেই—যদি তা একই জাতি হিসেবে না উঠে একটি আদর্শবাদী জামায়াত হিসেবে দণ্ডায়মান হয়, যা সকল প্রকার ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতীয় স্বার্থপরতার বহু উর্ধে থেকে বিশ্বমানবতাকে আমন্ত্রণ জানাবে যার সমগ্র চেষ্টা-সাধনার চরম লক্ষ্য হবে নির্দিষ্ট কতকগুলো আদর্শের অনুসরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতার মুক্তিসাধন এবং সেই আদর্শ ও নীতিসমূহের ভিত্তিতে মানবজীবনের গোটা ব্যবস্থার পুনপ্রতিষ্ঠা সাধন। ঐসব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এই দল যে জাতি গঠন করবে, তাতে জাতীয়, ভৌগলিক, শ্রেণীগত ও বংশীয় বা গোত্রীয় বৈষম্যের নামগন্ধও থাকবে না। সকল মানুষই তাতে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এবং সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে নেতৃত্ব পথ নির্দেশকারী মর্যাদা কেবল সেই ব্যক্তি বা সেই মানব সমষ্টিই লাভ করতে পারবে, যারা সেই আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করে চলার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে। তখন তার বংশ মর্যাদা বা আঞ্চলিক জাতীয়তার কোন তারতম্য বিচার হবে না এমনকি, এই নতুন

সমাজে এতদূরও হতে পারে যে, বিজিত জাতির লোক ঈমান এনে নিজেকে অন্যান্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শানুসরণে এবং যোগ্যতার প্রমাণ করতে পারলে বিজয়ী তার সকল চেষ্টা ও যুদ্ধ সংগ্রাম লব্ধ যাবতীয় 'ফল' তার পদতলে এনে ঢেলে দিবে এবং তাকে 'নেতা' রূপে স্বীকার করে নিজে 'অনুসারী' হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হবে।

এমন একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাদের প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় ততই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মহাত্মের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। সে তার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি—তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তি সত্ত্বা কিংবা তাদের জাতীয়তার সাথে এর কোন শত্রুতা নেই। শত্রুতা আছে শুধু তাদের গৃহীত জীবনধারা ও চিন্তা মতবাদের সাথে। তা পরিত্যাগ করলেই তার রক্ত পিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালবাসা দান করতে পারে—বুকের সঙ্গে মিলাতে পারে। পরন্তু সে আরও প্রমাণ করবে যে, বিরুদ্ধ পক্ষের ধন-দৌলত কিংবা তাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তার কোন লালসা নেই, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনই তার একমাত্র কাম্য। তা লাভ হলেই যথেষ্ট। তাদের ধন-দৌলত তাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হবে। কঠিন কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কুটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধের প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এজন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির উপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রথমত আদর্শ হিসেবে সততা ও ন্যায়বাদের যে মানদণ্ড বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছিল, নিজেকে এর কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্য এবং খাঁটি বলে প্রমাণ করে দেয়। শত্রু পক্ষের ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী, নিষ্ঠুর ও নির্দয় সৈন্যদের সাথে এই দলের আল্লাহভীরু, পবিত্র চরিত্র, মহান আত্মা, দয়ার্দ্র হৃদয় ও উদার উন্নত মনোবৃত্তি সম্পন্ন মুজাহিদদের প্রবল মোকাবিলা হয়, তখন এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত মানবিক ও গুণ-গরিমা প্রতিপক্ষের পাশবিক ও বর্বরতার উপর উজ্জ্বল

উদ্ভাসিত হয়ে লোকচক্ষুর সামনে প্রকটিত হতে থাকে। শত্রু পক্ষের লোক আহত বা বন্দী হয়ে আসলে চতুর্দিকে ভদ্রতা, সৌজন্য, পবিত্রতা ও নির্মল মানসিক চরিত্রের রাজত্ব বিরাজমান দেখতে পায় এবং তা দেখে তাদের কলুষিত আত্মাও পবিত্র ভাবধারার সংস্পর্শে কলুষমুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এই দলের লোক যদি বন্দী হয়ে শত্রু পক্ষের শিবিরে চলে যায়, সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় পরিবেশে এদের মনুষ্যত্বের মহিমা আরো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এরা কোন দেশ জয় করলে বিজিত জনগণ প্রতিশোধের নির্মম আঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা করুণা পায়, কঠোরতা নির্মমতার পরিবর্তে সহানুভূতি ; গর্ব অহংকার ও ঘৃণার পরিবর্তে পায় সহিষ্ণুতা ও বিনয় ; ভর্ৎসনার পরিবর্তে পায় সাদর সম্ভাষণ এবং মিথ্যা প্রচারণার পরিবর্তে সত্যের মূলনীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রচার। আর এসব দেখে খুশিতে তাদের হৃদয় মন ভরে উঠে। তারা দেখতে পায় যে, বিজয়ী সৈনিকরা তাদের নিকট নারীদেহের দাবী করে না, গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধন-সম্পত্তি খোঁজ করে বেড়ায় না, তাদের শৈল্পিক গোপন রহস্যের সন্ধান করার জন্যও এরা উদগ্রীব নয়, তাদের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পদকে ধ্বংস করার চিন্তাও এদের নেই। তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সম্মান মর্যাদার উপরও এরা হস্তপেক্ষ করে না। বিজিত জনতা শুধু দেখতে পায়, এরা এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এই জন্য যে বিজিত দেশের—একটি মানুষেরও সম্মান বা সতীত্ব যেন নষ্ট না হয়, কারো ধনমাল যেন ধ্বংস না হয়, কেউ যেন সংগত অধিকার হতে বঞ্চিত না থেকে যায়, কোনরূপ অসচ্চরিত্রতা তাদের মধ্যে যেন ফুটে না উঠে এবং সামগ্রিক জুলুম-পীড়ন যেন কোনরূপেই অনুষ্ঠিত হতে না পারে।

পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাদের অত্যাচর, নির্মমতা ও অমানুষিক ধ্বংসলীলায় আর্তনাদ করে উঠে—একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, এই ধরনের আদর্শবাদী জিহাদের সাথে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ সংগ্রামের কত আকাশ স্পর্শী পার্থক্য হয়ে থাকে। এই ধরনের লড়াইয়ে উচ্চতর মানবিকতা নগণ্য বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ সহকারে ও শত্রুপক্ষের লৌহবর্ম রক্ষিত পাশবিকতাকে যে অতি সহজেই প্রথম আক্রমণেই পরাজিত করবে তাতে আর সন্দেহ কি ? বস্তুত উন্নত নির্মল নৈতিকতার হাতিয়ার বন্দুক-কামানের গোলাগুলি অপেক্ষাও দূর পাল্লায় গিয়ে লক্ষ্যভেদ করবে। প্রচণ্ড লড়াইয়ে কঠিন মুহূর্তেও শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হবে। দেশের পূর্বে মানুষের হৃদয়-মন বিজিত হবে, দেশের পর দেশ-জনপদের পর জনপদ বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে মুক্তির চিরন্তন স্বাদ গ্রহণ করবে।

ওদিকে এই সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা অত্যল্প উপায়-উপাদান সহকারে গঠনমূলক কাজ শুরু করবে, তখন সেনাপতি, সৈনিক, যোদ্ধা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম—সবকিছুই ধীরে ধীরে বিরোধী শিবির হতে পাওয় যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আবার এই উক্তি নিছক কল্পনা-ধারণা এবং আন্দাজ অনুমানের উপরই ভিত্তিশীল নয়, নবী করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহ হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইতিপূর্বেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং আজও এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। অবশ্য সেজন্য শর্ত এই যে, এরূপ অভিজ্ঞতালাভের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও সৎ সাহস নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমি আশা করি, আমার উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা হতে আমার একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শক্তিই হচ্ছে শক্তির আসল উৎস। কাজেই দুনিয়ার কোন মানব সমষ্টি যদি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে ইসলামী নৈতিকতারও আধার হয় তখন তার বর্তমানে অন্য কোন দলের পক্ষে দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কঠিন এবং স্বভাবতই তা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের বর্তমান অধপতনের মূলীভূত কারণ কি উপরের আলোচনা হতে তাও আশা করি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যারা না বৈষয়িক উপায়-উপাদান প্রয়োগ করবে, না মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত হবে, আর না সমষ্টিগতভাবে ইসলামী নৈতিকতার অস্তিত্বই তাদের মধ্যে থাকবে, তারা যে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে কিছুতেই অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, এটা সর্বজন বিদিত সত্য। এমতাবস্থায় এমনসব কাফের লোকদেরই কর্তৃত্ব দান করা আল্লাহর স্থায়ী রীতি, যাদের ইসলামী নৈতিকতা না থাকলেও মৌলিক মানবীয় চরিত্র তো রয়েছে, আর জাগতিক জড় উপায়-উপাদান ব্যবহার এবং শাসন-শৃংখলা রক্ষার দিক দিয়ে নিজেদেরকে অন্যের তুনলায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে। এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন অভিযোগ করার থাকলে, তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হতে পারে, এ ব্যাপারে আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম-বিধানের আদৌ কোন ক্রুটি নেই। আর নিজেদের বিরুদ্ধে যদি বাস্তবিকই কোন অভিযোগ জাগে, তাদের অনিবার্য ফলে নিজেদের যাবতীয় দোষ-ক্রুটি সংশোধন করার জন্য যত্নবান হওয়া এবং যে কারণে মুসলমান নেতৃত্বের আসন হতে বিচ্যুত হয়ে অনুগত হতে বাধ্য হয়েছে সেই কারণ দূর করতে বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতপর সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামী নৈতিকতার মূল ভিত্তিসমূহের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, আমি জানি এ ব্যাপারে মুসলমানদের ধারণা নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে অস্পষ্ট এবং বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই অস্পষ্টতা ও অসংঘবদ্ধতার কারণেই ইসলামী নৈতিকতা আসলে যে কি জিনিস এবং এদিক দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠন ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কোন জিনিস কোন শ্রেণী পরম্পরা ও ক্রমিক ধারা অনুযায়ী তার মধ্যে লালিত-পালিত করা অপরিহার্য তা খুব কম লোকই জানতে পেরেছে।

ইসলামী নৈতিকতার চার পর্যায়

ইসলামী নৈতিকতা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষানুযায়ী এর চারটি ক্রমিক পর্যায় রয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় ইসলাম, তৃতীয় তাকওয়া এবং চতুর্থ ইহসান। বস্তুত এ চারটি পর্যায় পরস্পর এমন স্বাভাবিক শ্রেণী পরম্পরা অনুযায়ী সুসংবদ্ধ হয়ে আছে যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী পর্যায়ই পূর্ববর্তী পর্যায় হতে উদ্ভূত এবং অনিবার্যরূপে এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য নিম্নবর্তী পর্যায় যতক্ষণ না দৃঢ় পরিপক্ক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপরের পর্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। এই সমগ্র ইমারতের মধ্যে ঈমান হচ্ছে প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। এরই উপর ইসলামের স্তর রচিত হয়, তার উপর 'তাকওয়া' এবং সকল পর্যায়ের উপরে হয় 'ইহসানের' প্রতিষ্ঠা। ঈমান না হলে ইসলামে তাকওয়া কিংবা ইহসান লাভ করার কোন সম্ভাবনাই হতে পারে না। ঈমান দুর্বল হলে তার উপর উচ্চতর পর্যায়সমূহের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিলেও তা অতিশয় কাঁচা, শিথিল ও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়বে। এই ঈমান সংকীর্ণ হলে যতখানি তার ব্যাপ্তি হবে, ইসলাম এবং ইহসান ঠিক ততখানি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব ঈমান যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ, সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত না হবে, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তার উপর ইসলাম, তাকওয়া কি ইহসান প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাও করতে পারে না। অনুরূপভাবে 'তাকওয়ার' পূর্বে 'ইসলাম' এবং ইহসানের পূর্বে 'তাকওয়া' বিশুদ্ধকরণ সুষ্ঠুতা বিধান এবং সম্প্রসারিতকরণ অপরিহার্য। কিন্তু সাধারণত আমরা এটাই দেখতে পাই যে, এই স্বাভাবিক ও নীতিগত শ্রেণী পরম্পরার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় এবং ঈমান ও ইসলামের পর্যায়ে পূর্ণতা সাধন ছাড়াই তাকওয়া ও ইহসানের আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়। এটা অপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণত লোকদের মনে ঈমান ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা বদ্ধমূল

হয়ে রয়েছে। এজন্যই শুধু বাহ্যিক বেশ-ভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খানা-পিনা প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করতে পারলেই 'তাকওয়ার' পূর্ণতা সাধন হয়ে গেল। আর ইবাদাতের মধ্যে নফল নামায, দরূদ, অজিফা পাঠ এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ কাজ করলেই ইহসানের উচ্চতম অধ্যায় লাভ হয় বলে ধারণা করে। অথচ এ ধরনের তাকওয়া ও ইহসানের সংগে সংগে লোকদের জীবনের এমন অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শনও পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে অনায়াসে বলা চলে যে, তাকওয়া ও ইসলাম তো দূরের কথা, আসল ঈমানই এখন পর্যন্ত তার মধ্যে পরিপক্কতা ও সুষ্ঠুতা লাভ করেনি। এরূপ ভুল ধারণা ও ভুল দীক্ষার পদ্ধতি আমাদের মধ্যে যতদিন বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা ইসলামী নৈতিকতার অপরিহার্য অধ্যায়সমূহ কখনো অতিক্রম করতে পারব বলে আশা করা যায় না। এজন্যই ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান—এই চারটি অধ্যায় সম্পর্কে পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং সেই সংগে এদের স্বাভাবিক ও ক্রমিক শ্রেণী পরম্পরাও অনুধাবন করা একান্তই অপরিহার্য।

ঈমান

সর্বপ্রথম ঈমান সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। কারণ, এটা ইসলামী জিন্দেগীর প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। তাওহীদ ও রিসালাত—আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে রাসূলরূপে স্বীকার করে নেয়াই এক ব্যক্তির ইসলামের পরিসীমায় অনুপ্রবেশ লাভের জন্য যথেষ্ট। তখন তার সাথে ঠিক একজন মুসলমানেরই ন্যায় আচরণ করা আবশ্যক—তখন এরূপ আচরণ ও ব্যবহার পাবার তার অধিকারও হয়। কিন্তু সাধারণ স্বীকারোক্তি এমনি আইনগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হলেও ইসলামী জিন্দেগীর সমগ্র 'ত্রিতল বিশিষ্ট উচ্চ প্রাসাদের' ভিত্তিপ্রস্তর হওয়ার জন্যও কি এটা যথেষ্ট হতে পারে? সাধারণ লোকেরা এরূপই ধারণা করে। আর এজন্য যেখানেই এই স্বীকারোক্তিটুকু পাওয়া যায়, সেখানেই বাস্তবিকভাবে ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের উচ্চতলসমূহ তৈরী করার কাজ শুরু করে দেয়া হয়। ফলে সাধারণত এটা হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদেরই (?) অনুরূপ ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। বস্তুত একটি পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী গঠনের জন্য সুবিস্তারিত সম্প্রসারিত, ব্যাপক গভীর ও সুদৃঢ় ঈমান একান্তই অপরিহার্য। ঈমানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হতে জীবনের কোন একটি দিক বা বিভাগও যদি বাইরে পড়ে থাকে, তবে ইসলামী জিন্দেগীর সেই দিকটিই পুনর্গঠন লাভ হতে

বঞ্চিত থেকে যাবে এবং তার গভীরতায় যতটুকু অভাবই থাকবে, ইসলামী জিন্দিগীর প্রাসাদ সেখানেই দুর্বল ও শিথিল হয়ে থাকবে, এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ "আল্লাহর প্রতি ঈমানের" উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত আল্লাহর প্রতি ঈমান দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহকে স্বীকার করার উক্তিটুকু সাদাসিধে পর্যায় অতিক্রম করে বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর এর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও "আল্লাহর প্রতি ঈমান" একথা বলে শেষ করা যায় যে, আল্লাহ বর্তমান আছেন। সন্দেহ নেই, পৃথিবীর তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এটাও সত্য কথা। কোথাও আরও একটু অগ্রসর হয়ে আল্লাহকে মা'বুদ স্বীকার করা হয় এবং তার উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তাও মেনে নেয়া হয়। কোথাও আল্লাহর গুণ এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও ব্যাপক ধারণাও শুধু এতটুকু হয় যে, আলেমুল গায়েব, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, প্রার্থনা শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূরণকারী তিনি এবং ইবাদাতের সকল খুঁটিনাটি রূপ একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। এখানে কেউ তার শরীক নেই। আর "ধর্মীয় ব্যাপারসমূহে" চূড়ান্ত দলীল হিসেবে আল্লাহর কিতাবকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু এরূপ বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাসের পরিণামে যে একই ধরনের জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না, তা সুস্পষ্ট কথা। বরং যে ধারণা যতখানি সীমাবদ্ধ, কর্মজীবনে ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অনিবার্যরূপে ততখানি সংকীর্ণ হওয়াই দেখা দিবে এমনকি যেখানে সাধারণ ধর্মীয় ধারণা অনুযায়ী "আল্লাহর প্রতি ঈমান" অপেক্ষাকৃতভাবে অতীব ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হবে, সেখানেও ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তবরূপ এই হবে যে, একদিকে আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহর "আনুগত্য" করার কাজও সেই সংগেই সম্পন্ন করা হবে কিংবা ইসলামী নেজাম ও কাফেরী নেজাম মিলিয়ে একটি জগাখিচুরী তৈরী করা হবে।

এভাবে "আল্লাহর প্রতি ঈমান" এর গভীরতার মাপকাঠিও বিভিন্ন। কেউ আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সাধারণ জিনিসকেও আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় না। কেউ আল্লাহর কোন কোন জিনিস অপরাপর জিনিস অপেক্ষা 'অধিক প্রিয়' বলে মনে করে। আবার অনেক জিনিসকে আল্লাহর অপেক্ষাও প্রিয়তর হিসেবে গ্রহণ করে ; কেউ নিজের জান-মাল পর্যন্ত আল্লাহর

জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু নিজের মনের ঝোঁক-প্রবণতা, নিজের মতবাদ ও চিন্তাধারা কিংবা নিজের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে প্রস্তুত হয় না। ঠিক এই হার অনুসারেই ইসলামী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর যেখানেই ঈমানের বুনিয়াদ দুর্বল থেকে যায়, ঠিক সেখানেই মানুষের ইসলামী নৈতিকতা নির্মমভাবে প্রতারিত হয়।

বস্তুত ইসলামী জিন্দেগীর একটি বিরাট প্রাসাদ একমাত্র সেই তাওহীদ স্বীকারের উপরই স্থাপিত হতে পারে, যা মানুষের গোটা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের উপর সম্প্রসারিত হবে, যার দরুন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে এবং নিজের প্রত্যেকটি বস্তুতেই "আল্লাহর মালিকানা" বলে মনে করবে, প্রত্যেকটি মানুষ সেই এক আল্লাহকেই নিজের এবং সমগ্র পৃথিবীর একই সংগত মালিক, মাবুদ, প্রভু অনুসরণযোগ্য এবং আদেশ-নিষেধের নিরংকুশ অধিকারী বলে মেনে নিবে। মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য জীবনব্যবস্থার উৎস একমাত্র তাঁকেই স্বীকার করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য বিমুখতা কিংবা তাঁর জীবন বিধান উপেক্ষা করা অথবা আল্লাহর নিজ সত্তা ও গুণ-গরিমা এবং অধিকার ও ক্ষমতায় অন্যের অংশীদারিত্ব যেদিক দিয়ে এবং যেরূপেই রয়েছে, তা মারাত্মক ভ্রান্তি ও গোমরাহী হবে—এই নিগূঢ় সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই প্রাসাদ অত্যধিক সুদৃঢ় হওয়া ঠিক তখনই সম্ভব, যখন কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ চেতনা ও ইচ্ছা সহকারে তার নিজ সত্তা, যাবতীয় ধনপ্রাণ নিঃশেষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত করবে। নিজের মনগড়া ভাল-মন্দের মানদণ্ড চূর্ণ করে সর্বোতভাবে ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে নিজস্ব মতবাদ, চিন্তাধারা, মনোবাসনা, মানসিক ভাবধারা ও চিন্তাপদ্ধতিকে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের (কুরআনের) আদর্শে ঢেলে গঠন করবে। যেসব কাজ সুসম্পন্ন করার মারফতে আল্লাহর আনুগত্য করা হয় না, বরং যাতে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় তা সবকিছুই পরিত্যাগ করবে। নিজের হৃদয়-মনের সর্বোচ্চ স্থানে অভিষিক্ত করবে আল্লাহর প্রেম—আল্লাহর ভালবাসাকে এবং মনের মণিকোঠা হতে আল্লাহ অপেক্ষা প্রিয়তর 'ভূত' যেখানে যেখানে আছে, তা আতিপাতি করে খুঁজে বের করবে এবং তাকে চূর্ণ করবে। নিজের প্রেম-ভালবাসা, নিজের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, নিজের আগ্রহ ও ঘৃণা, নিজের সন্ধি ও যুদ্ধ—সবকিছুকেই আল্লাহর মরজীর অধীন করে দিবে ফলে মন শুধু তাই পেতে চাইবে যা আল্লাহ পসন্দ করেন না, তা হতে মন দূরে পলায়ন করতে চেষ্টা করবে। বস্তুত

আল্লাহর প্রতি ঈমানের এটাই হচ্ছে নিগূঢ় অর্থ। অতএব যেখানে ঈমানই এই সকল দিক দিয়ে গভীর, ব্যাপক ও সুদৃঢ় এবং পরিপক্ক না হবে, সেখানে তাকওয়া ও ইসলাম যে হতেই পারে না তা সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, দাড়ির দৈর্ঘ এবং পোশাকের কাটছাট অথবা তসবীহ পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামায ইত্যাদি দ্বারা ঐরূপ ঈমানের অভাব কি কখনো পূর্ণ হতে পারে ?

এই দৃষ্টিতে ঈমানের অন্যান্য দিকগুলো সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে ও ব্যাপারেই নবীকে একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শকরূপে মেনে না নিবে এবং তাঁর নেতৃত্ব বিরোধী কিংবা এর প্রভাব মুক্ত যত নেতৃত্বই দুনিয়াতে প্রচলিত হবে, তার সবগুলোকেই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাহার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের প্রতি ঈমান কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহর কিতাব প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ও নীতিসমূহ ছাড়া অন্য কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হওয়ার এক বিন্দুভাব বর্তমান থাকলে কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত ব্যবস্থাকে নিজের ও সমগ্র পৃথিবীর জীবন বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতার কিছুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে না, সে ঈমান বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনুরূপভাবে পরকালের প্রতি ঈমান ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না—যতক্ষণ না মানুষের মন অকুণ্ঠভাবে পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দান করবে। পরকালীন কল্যাণের মূল্যমানকে ইহকালীন কল্যাণের মূল্যমান অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য—শেষোক্তটিকে প্রথমটির মোকাবিলায় প্রত্যাখ্যান যোগ্য বলে মনে করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার বিশ্বাস তার জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই তাকে ভাবতে ও সংযত করে তুলবে। বস্তুত এই মূল ভিত্তিসমূহই যেখানে পূর্ণ হবে না—সুদৃঢ় ও ব্যাপক হবে না, সেখানে ইসলামী জিন্দেগীর বিরাট প্রাসাদ কিসের উপর দাঁড় করান যেতে পারে, তা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছেন ? কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যখন এই ভিত্তিসমূহের পূর্ণতা ব্যাপকতা ও পক্কতা সাধন ছাড়াই ইসলামী নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করল, তখন ইসলামী সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা গেল। দেখা গেল আল্লাহর কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দানকারী বিচারপতি ; শরীয়াত বিরোধী আইনের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী ও উকিল ; কাফেরী সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনের কাজ-কর্মসম্পন্নকারী কর্মী ; কাফেরী-

আদর্শের তমদ্দুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থানুযায়ী জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী নেতা ও জনতা সকলের জন্যই তাকওয়া ও ইহসানের উচ্চতম পর্যায়সমূহ হাসিল করা একেবারে সহজ হয়ে গেল। সকলেরই জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। আর তাদের জীবনের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, ধরন-ধারণ ও আচার-অনুষ্ঠানকে একটি বিশেষ ধরনে গঠন করা এবং কিছু নফল নামায, রোযা ও জেকের-আজকারের অভ্যাস করাই সেজন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হলো।

ইসলাম

ঈমানের উপরোক্ত ভিত্তিসমূহ যখন বাস্তবিকই পরিপূর্ণ ও দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। তখনই তার উপর ইসলামের দ্বিতীয় অধ্যায় রচনা করার কাজ শুরু হয়। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে ঈমানেরই বাস্তব অভিব্যক্তি—ঈমানেরই কর্মরূপ। ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক বীজ ও বৃক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ। বীজের মধ্যে যা কিছু যেভাবে বর্তমান থাকে, তাই বৃক্ষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি, বৃক্ষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বীজের মধ্যে কি ছিল, আর কি ছিল না, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বীজ না হওয়া সত্ত্বেও বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন কেউ ধারণা করতে পারে না, অনুরূপভাবে এটাও ধারণা করা যায় না যে, জমি বন্ধ্যা ও অনুর্বর নয় এমন জমিতে বীজ বপন করলে বৃক্ষ অংকুরিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও ইসলামের অবস্থা ঠিক এরূপ। যেখানে বস্তুতই ঈমানের অস্তিত্ব থাকবে, সেখানে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে কর্মজীবনে, নৈতিকতায়, গতিবিধিতে, রুচি ও মানসিক ঝোঁক-প্রবণতায়, স্বভাব-প্রকৃতিতে, দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকারের দিকে ও পথে, সময়, শক্তি এবং যোগ্যতার বিনিয়োগ জীবনের প্রতিটি দিকে ও বিভাগে, প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই এর বাস্তব অভিব্যক্তি ও বহিঃপ্রকাশ হবেই হবে। উল্লেখিত দিক-সমূহের মধ্যে কোন একটি দিকেও যদি ইসলামের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম ও ভাবধারা প্রকাশ হতে দেখা যায়, তবে নিসন্দেহে মনে করতে হবে যে, সেই দিকটি ঈমান শূন্য অথবা তা থাকলেও একেবারে নিঃসার, নিস্তেজ ও অচেতন হয়ে রয়েছে—যা থাকা বা না থাকা উভয়ই সম্পূর্ণ সমান। আর বাস্তব কর্মজীবন যদি সম্পূর্ণরূপে অমুসলিমদের ধারা-পদ্ধতিতে যাপিত হয়, তবে তার মনে ঈমানের অস্তিত্ব নেই। কিংবা থাকলেও তার ক্ষেত্র অত্যন্ত অনুর্বর ও উৎপাদন শক্তিহীন হওয়ার কারণে ঈমানের বীজই তথায় অংকুরিত হতে পারেনি বলে মনে করতে হবে। যা হোক, আমি কুরআন ও হাদীস যতদূর বুঝতে পেরেছি তার উপরে নির্ভর করে বলতে পারি যে, মনের মধ্যে ঈমান

বর্তমান থাকা এবং কর্মজীবনে ইসলামের বাস্তব প্রকাশ না হওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

(এই সময় একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, ঈমান ও আমলকে কি আপনি একই জিনিস বলে মনে করেন ? অথবা এই দু'টির মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মওদূদী বলেন—)

এ সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্রকার ও কালাম শাস্ত্রবিদদের উত্থাপিত বির্তক অল্প সময়ের জন্য মন হতে দূরে রেখে সরাসরিভাবে কুরআন মজীদ হতে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করুন। কুরআন হতে সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় যে, বিশ্বাসগত ঈমান ও বাস্তব কর্মজীবনের ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও সৎকাজের (আমলে সালেহ) একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সকল ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি কেবল সেই বান্দাদের জন্য যারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ঈমানদার এবং বাস্তব কর্মের দিক দিয়ে পূর্ণরূপে 'মুসলিম' পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালা যেসব লোককে 'মুনাফিক' বলে নির্দিষ্ট করেছেন তাদের বাস্তব কর্মের দোষ-ত্রুটির ভিত্তিতেই তাদের ঈমানের অন্তসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন এবং বাস্তব কর্মগত ইসলামকেই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আইনত কাউকে 'কাফের' ঘোষণা করা এবং মুসলিম জাতির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সে ব্যাপারে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কিন্তু পৃথিবীতে শাস্ত্রীয় আইন প্রযুক্ত হতে পারে যে ঈমান ও ইসলামের উপর, এখানে আমি সেই ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করছি না। বরং যে ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং পরকালীন ফলাফল যার ভিত্তিতেই মীমাংসিত হবে, এখানে আমি কেবল সেই ঈমান সম্পর্কেই বলছি। আইনগত দৃষ্টিভংগী পরিত্যাগ করে প্রকৃত ব্যাপার ও নিগূঢ় সত্যটি যদি আপনি জানতে চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চিতরূপেই দেখতে পাবেন যে, কার্যত যেখানে সামনে আত্মসমর্পণ, আত্মোৎসর্গ ও পরিপূর্ণরূপে আত্মাহুতির অভাব রয়েছে, যেখানে নিজ মনের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়নি—পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে চলার সংগে সংগে কার্যত 'অন্য শক্তির'ও আনুগত্য করা হচ্ছে, যেখানে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার পরিবর্তে অন্যান্য কাজের দিকেই মনের ঝোঁক ও আন্তরিক নিষ্ঠা রয়েছে, যেখানে

আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে চেষ্টা-সাধনা এবং দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করা হচ্ছে না, বরং এ সবকিছুই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে—ভিন্ন উদ্দেশ্যে, সেখানে যে ঈমানের মৌলিক ত্রুটি রয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। আর অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের উপর তাকওয়া ও ইহসানের অধ্যায় যে রচিত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। বাহ্যিক বেশ-ভূষার তাকওয়া কিংবা ইহসানের কৃত্রিম অনুকরণের চেষ্টা করলেও এর প্রকৃত ভাবধারা লাভ করা সম্ভব নয়। বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত অন্তসারশূন্য হলে এবং অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে বাহ্যিক বেশ-ভূষার সামঞ্জস্য না হলে তা একটি সুশ্রী ও সুঠাম মৃতদেহের অনুরূপ হয়ে থাকে। এর বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও বেশ-ভূষা যতই সুন্দর ও উত্তম হোক না কেন, তা প্রাণশূন্য বলে জনগণ তা দেখে প্রতারিত হতে পারে মাত্র। এই বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও সুঠাম দেহের প্রতি কোন কাজের আশা করে থাকলে বাস্তব ঘটনাই তার ব্যর্থতা প্রমাণ করবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে নিসন্দেহে জানতে পারা যাবে যে, একটি কুৎসিত জীবিত মানুষ একটি সুশ্রী লাশ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রকাশ্য বেশ-ভূষার দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া ও আত্মপ্রতারণা করা সহজ বা সম্ভব, কিন্তু বাস্তব পরীক্ষায় এর কোন মূল্যই প্রমাণিত হয় না—আল্লাহর নিকট এর একবিন্দু মূল্য হওয়া তো দূরের কথা। অতএব, বাহ্যিক নয়, প্রকৃত ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ তাকওয়া ও ইহসান লাভ করতে হলে—আর এটা ছাড়া দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ মাত্রই সম্ভব নয়—আমার একথা মনের পৃষ্ঠায় বদ্ধমূল করে নিন যে, উপরের এ দু'টি পর্যায় কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না, যতক্ষণ না ঈমানের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মগত ইসলাম কার্যত আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের ভিতর দিয়ে, নিসন্দেহে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না।

তাকওয়া

তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে 'তাকওয়া' কাকে বলে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। তাকওয়া কোন বাহ্যিক ধরন-ধারণ এবং বিশেষ কোন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়। তাকওয়া মূলত মানব মনের সেই অবস্থাকেই বলা হয় যা আল্লাহর গভীর ভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির দরুন সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় হবে, নিজে আল্লাহর দাসানুদাস—এই চেতনা

জাগ্রত থাকবে, আল্লাহর সামনে নিজের দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ থাকবে এবং এই একটি পরীক্ষাগার, আল্লাহ জীবনের একটি নির্দিষ্ট আয়ুদান করে এখানে পাঠিয়েছেন, এই খেয়াল তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে। পরকালে ভবিষ্যতের ফায়সালা এই দৃষ্টিতে হবে যে, এই নির্দিষ্ট অবসরকালের মধ্যে এই পরীক্ষাগারে নিজের শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা কিভাবে প্রয়োগ করেছে, আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী লাভ করতে পেরেছে, তার ব্যবহার কিভাবে করেছে এবং আল্লাহর নিজস্ব বিধান অনুযায়ী জীবনকে বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব মানুষের সাথে বিজড়িত করেছে, তাদের সাথে কিরূপ কাজ-কর্ম ও লেন-দেন করা হয়েছে—একথাটিও মনের মধ্যে জাগরুক থাকবে।

বস্তুত এরূপ অনুভূতি ও চেতনা যার মধ্যে তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে, তার হৃদয় মন জাগ্রত হবে, তার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হবে, আল্লাহর মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বস্তুই তার মনে খটকার সৃষ্টি করবে, আল্লাহর মনোনীত প্রত্যেকটি জিনিসই তার রুচিতে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন সে নিজেই নিজের যাচাই করবে। তার কোন্ ধরনের ঝোঁক ও ভাবধারা লালিত-পালিত হচ্ছে নিজেই তার জরীপ করবে। সে কোন্ সব কাজ-কর্মে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করছে, তার হিসেব সে নিজেই করতে শুরু করবে। তখন সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ কোন কাজ করা দূরের কথা সংশয়পূর্ণ কোন কাজেও লিপ্ত হতে সে নিজে ইতস্তত করবে। তার অন্তর্নিহিত কর্তব্যজ্ঞানই তাকে আল্লাহর সকল নির্দেশ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতে বাধ্য করবে। যেখানেই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালংঘন হওয়ার আশংকা হবে, সেখানেই তার অন্তর্নিহিত আল্লাহ-ভীতি তার পদযুগলে প্রবল কম্পন সৃষ্টি করবে—চলৎশক্তি রহিত করে দিবে। আল্লাহর হক ও মানুষের হক রক্ষা করা স্বতস্ফূর্ত রূপেই তার স্বভাবে পরিণত হবে। কোথাও সত্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ তার দ্বারা না হয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মন সতত কম্পমান থাকবে। এরূপ অবস্থা বিশেষ কোন ধরনে কিংবা বিশেষ কোন পরিধির মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না, ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা-পদ্ধতি এবং তার সমগ্র জীবনের কর্মধারাই এর বাস্তব অভিব্যক্তি হবে। এর অনিবার্য প্রভাবে এমন এক সুসংবদ্ধ সহজ, ঋজু এবং একই ভাবধারা বিশিষ্ট ও পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি গঠিত হবে, যাতে সকল দিক দিয়েই একই প্রকারের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠবে। পক্ষান্তরে কেবল বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও কয়েকটি নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ এবং নিজেকে কৃত্রিমভাবে কোন পরিমাপযোগ্য ছাঁচে ঢেলে নেয়াকেই যেখানে তাকওয়া বলে ধরে নেয়া

হয়েছে, সেখানে শিখিয়ে দেয়া কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ধরন ও পদ্ধতিতে 'তাকওয়া' পালন হতে দেখা যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে এমনসব চরিত্র, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মনীতি পরিলক্ষিত হবে, যা 'তাকওয়া' তো দূরের কথা ঈমানের প্রাথমিক স্তরের সাথেও এর কোন সামঞ্জস্য হবে না। এটাকেই হযরত ঈসা (আ) উদাহরণের ভাষায় বলেছেন ঃ "এক দিকে মাছি বলে বাইর কর আর অন্যদিকে বড় বড় উট অবলীলাক্রমে গলধকরণ কর।"

প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়ার পারস্পরিক পার্থক্য অন্য একভাবেও বুঝতে পারা যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটি তীব্র ও জাগ্রত রুচি-অনুভূতি বর্তমান রয়েছে, সে নিজেই অপবিত্রতা ও পংকিলতাকে ঘৃণা করবে—তা যে আকারেই হোক না কেন এবং পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবে। তার বাহ্যিক অনুষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হলেও কোন আপত্তি থাকবে না। অপর ব্যক্তির আচরণ এর বিপরীত হবে। কারণ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কোন স্বতস্ফূর্ত চেতনা তার মধ্যে নেই ; বরং ময়লা ও অপবিত্রতার একটি তালিকা কোথা হতে লিখে নিয়ে সবসময়ই সঙ্গে রেখে চলে, ফলে এই ব্যক্তি তার তালিকায় উল্লেখিত ময়লাগুলো হতে নিশ্চয় আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উহা অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও ঘৃণিত বহু প্রকার পংকিলতার মধ্যে সে অজ্ঞতাসারেই লিপ্ত হয়ে পড়বে, তা নিসন্দেহে। কারণ, তালিকায় অনুল্লেখিত পংকিলতা যে কোনরূপ পংকিল বা ঘৃণিত হতে পারে এটা সে মাত্রই বুঝতে পারে না। এই পার্থক্য কেবল নীতিগত ব্যাপারেই নয়, চারদিকে যাদের তাকওয়ার একেবারে ধুম পড়ে গেছে তাদের জীবনে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তারা একদিকে শরীয়াতে খুঁটিনাটি বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করে থাকে, এমনকি দাড়ির দৈর্ঘ্য একটি বিশেষ পরিমাপ হতে একটু কম হলেই তাকে জাহান্নামী হওয়ার "সুসংবাদ" শুনিয়ে দিতে সঙ্কোচবোধ করে না এবং ফিকাহর শাস্ত্রীয় মত হতে কোথাও সমাজ বিচ্যুতিকেও তারা দ্বীন ইসলামের সীমালংঘন করার সমান মনে করে। কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতি ও বুনিয়াদী আদর্শকে তারা চরমভাবে উপেক্ষা করে চলে। গোটা জীবনের ভিত্তি তারা স্থাপিত করেছে 'রোখছত' অনুমতি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির উপর। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েম করার জন্য চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করার দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তারা বহু সুযোগের পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। কাফেরী রাষ্ট্রব্যবস্থার

অধীনে তারা ইসলামী জিন্দেগী যাপনের প্রস্তুতি করার জন্যই সকল চেষ্টা ও সাধনা নিযুক্ত করে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, তাদেরই ভুল নেতৃত্ব মুসলমানদেরকে একথা বুঝিয়েছে যে, এক ইসলাম বিরোধী সমাজব্যবস্থার অধীন থেকে বরং এর 'খিদমত' করেও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ধর্মীয় জীবনযাপন করা যায় এবং তাতেই দ্বীন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ প্রতিপালিত হয়ে যায়—অতপর ইসলামের জন্য তাদেরকে আর কোন চেষ্টা-সাধনা বা কষ্ট স্বীকার আদৌ করতে হবে না। এটা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, তাদের সামনে দ্বীন ইসলামের মূল দাবী যেমন পেশ করা হয় এবং দ্বীন (ইসলামী নেজাম) কায়েম করার চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তারা এর প্রতি শুধু চরম উপেক্ষাই প্রদর্শন করে না, এটা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অন্যান্য মুসলমানকেও তা হতে বিরত রাখার জন্যে শত রকমের কৌশলের আশ্রয় নেয়। আর এতসব সত্ত্বেও তাদের 'তাকওয়া' ক্ষুণ্ন হয় না ; আর ধর্মীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের মনে তাদের 'তাকওয়ার' অন্তসারশূন্যতা সম্পর্কে সন্দেহ মাত্র জাগ্রত হয় না। এভাবেই প্রকৃত ও নিষ্ঠাপূর্ণ 'তাকওয়া' এবং কৃত্রিম ও অন্তসারশূন্য 'তাকওয়ার' পারস্পরিক পার্থক্য বিভিন্নরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু তা অনুভব করার জন্য 'তাকওয়া'র প্রকৃত ধারণা মনের মধ্যে পূর্বেই বদ্ধমূল হওয়া অপরিহার্য।

কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাচল, উঠাবসা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিকরূপ—যা হাদীস হতে প্রমাণিত হয়েছে—তাকে আমি হীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি, আমার পূর্বোক্ত আলোচনা হতে সেরূপ ধারণা করা মারাত্মক ভুল হবে, সন্দেহ নেই। এরূপ কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বস্তুত আমি শুধু একথাই বুঝাতে চাই যে, প্রকৃত তাকওয়াই হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তার বাহ্যিক প্রকাশ মুখ্য নয়, গৌণ। আর প্রকৃত 'তাকওয়ার মহিমা দীপ্তি যার মধ্যে স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠবে, তার সমগ্র জীবনই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে খাঁটি 'ইসলামী জীবন' রূপেই গড়ে উঠবে এবং তার চিন্তাধারায়, মতবাদে, তার হৃদয়াবেগ ও মনের ঝোঁক প্রবণতায়, তার স্বভাবগত রুচি তার সময় বন্টন ও শক্তিনিচয়ের ব্যয়-ব্যবহার, তার চেষ্টা-সাধনার পথে পন্থায়, তার জীবনধারায় ও সমাজ পদ্ধতিতে, তার আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে, তার সমগ্র পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও বিভাগে পূর্ণ ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার সাথে ইসলাম রূপায়িত হতে থাকবে। কিন্তু আসল তাকওয়া অপেক্ষা তার বাহ্যিক বেশ-ভূষাকেই যদি প্রাধান্য দেয়া হয়

—তার উপরই যদি অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রকৃত তাওয়ার বীজ বপন ও তার পরিবর্ধনের জন্য যত্ন না নিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি বাহ্যিক হুকুম-আহকাম পালন করান হয়, তবে বর্ণিত রূপেই যে এর পরিণাম ফল প্রকাশিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রথোমক্ত কাজ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, সেই জন্য অসীম ধৈর্যের আবশ্যক ; ক্রমবিকাশের নীতি অনুসারেই তা বিকশিত হয়ে এবং দীর্ঘ সময়ের সাধনার পরই তা সুশোভিত হয়ে থাকে —ঠিক যেমন একটি বীজ হতে বৃক্ষ সৃষ্টি এবং তাতে ফুল এবং ফল ধারণে স্বভাবতই বহু সময়ের আবশ্যক হয়। এ কারণেই স্থূল ও অস্থির স্বভাবের লোক ঐরূপ তাকওয়া লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে সাধারণত প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয় প্রকার তাকওয়া—তাকওয়ার বাহ্যিক বেশ-ভূষা, সহজলভ্য, অল্প সময় সাপেক্ষ। যেমন একটি কাষ্ঠখণ্ডের পত্র ও ফুল ফল বেঁধে "ফল ফুলে শোভিত একটি বৃক্ষ" দাঁড় করা হয়ত বা সহজ ; কিন্তু মূলত তা কৃত্রিম, প্রতারণামূলক এবং ক্ষণস্থায়ী। এজন্যই আজ শেষোক্ত প্রকারের তাকওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক বৃক্ষ হতে যা কিছু লাভ করার আশা করা যায় ; একটি কৃত্রিম বৃক্ষ হতে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা সর্বজনবিদিত সত্য।

ইহসান

এখন 'ইহসান' সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। পূর্বেই বলা হয়েছে, এটা ইসলামী জীবন প্রাসাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিল—সর্বোচ্চ পর্যায়। মূলতঃ'ইহসান' বলা হয় ঃ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর ইসলামের সাথে মনের এমন গভীরতম ভালবাসা, দুশ্ছেদ্যবন্ধন ও আত্মহারা প্রেম পাগল ভাবধারাকে, যা একজন মুসলমানকে 'ফানা ফিল ইসলাম'—'ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ' করে দিবে। তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভয়, যা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে সরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইহসানের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর প্রেম—আল্লাহর ভালবাসা। এটা মানুষকে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার জন্য সক্রিয় করে তোলে। এ দু'টি জিনিসের পারস্পরিক পার্থক্য একটি উদাহরণ হতে বুঝা যায়। সরকারী চাকুরীজীবিদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে, যারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্যানুভূতি ও আগ্রহ উৎসাহের সাথে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়। সমগ্র নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারা চলে এবং সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোন কাজই তারা কখনো করে না। এ ছাড়া আর এক ধরনের লোক থাকে, যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গপূর্ণ ভাবধারার সাথেই সরকারের কল্যাণ

কামনা করে। তাদের উপর যেসব কাজ ও দায়িত্ব অর্পিত হয়, তারা কেবল তাই সম্পপন্ন করে না, যেসব কাজে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে আন্তরিকতার সাথে সেইসব কাজও তারা আঞ্জাম দেবার জন্য যত্নবান হয় এবং এজন্য তারা আসল কর্তব্য ও দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোন ঘটনা ঘটে বসলেই তারা নিজেদের জানমাল ও সন্তান সবকিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কোথাও আইন-শৃঙ্খলা লংঘিত হতে দেখলে তাদের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহ ঘোষণার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং তা দমন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। নিজে সচেতনভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা তো দূরের কথা তার স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগতে দেয়া তাদের পক্ষে সহ্যাতীত হয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সাধ্যানুসারে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হোক এবং সর্বত্রই এরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়ে পত পত করতে থাকুক —এটাই হয় এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মনের বাসনা। এই দু'য়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীগণ হয় রাষ্ট্রের 'মুত্তাকী' আর শেষোক্ত কর্মচারীগণ হয় 'মুহসীন' উন্নতি এবং উচ্চপদ মুত্তাকীরাও লাভ করে থাকে, বরং যোগ্যতম কর্মচারীদের তালিকায় তাদেরই নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'মুহসিনদের' জন্য সরকারের নিকট যে সম্মান ও মর্যাদা হয়ে থাকে, তাতে অন্য কারোই অংশ থাকতে পারে না। ইসলামে 'মুত্তাকী' ও 'মুহসীনদের' পারস্পরিক পার্থক্য উক্ত উদাহরণ হতে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। ইসলামে মুত্তাকীদেরও যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তারাও শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হচ্ছে মুহসিনগণ। আর পৃথিবীতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র 'মুহসিনদের' দ্বারাই সুসম্পন্ন হতে পারে।

ইহসান-এর নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নেয়ার পর প্রত্যেক পাঠকই অনুমান করতে পারেন যে, যারা আল্লাহর দীন ইসলামকে কুফরের অধীন—কুফর কর্তৃক প্রভাবান্বিত দেখতে পায়, যাদের সামনে আল্লাহ নির্ধারিত সীমালংঘিত পর্যুদস্তই শুধু নয়—নিঃশেষে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়, আল্লাহর বিধান কেবল কার্যতই নয়—সর্বতোভাবেই বাতিল করে দেয়া হয়, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহীদের 'রাজত্ব' ও প্রভাব স্থাপিত হয়, কাফেরী ব্যবস্থার আধিপত্যে কেবল জনসমাজেই নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিপর্যয় উদ্ভূত হয় না—স্বয়ং মুসলিম জাতিও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নৈতিক ও বাস্তব

(কর্মগত) ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে—সেখানে এসব প্রত্যক্ষ করার পরও যাদের মনে একটু ব্যথা দুঃখ বা চিন্তা জেগে ওঠে না, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য উদ্যম ও প্রয়োজনীয়তাবোধই যাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, বরং যারা নিজেদের মনকে এবং মুসলমান জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী জীবনব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাকে নীতিগত ও কার্যত বরদাশত করার জন্য সান্ত্বনা দেয় ; এই শ্রেণীর লোকদেরকে 'মুহসিন' বলে কিরূপে মনে করা যেতে পারে, তা বুঝতে পারি না। আরো আশ্চার্যের বিষয়, এই মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহ করা সত্ত্বেও কেবল চাশত, এশরাক ও তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামায পড়ার দরুন, জেকের-আজকার, মোরাকাবা-মুশাহিদা, হাদীস-কুরআনের অধ্যাপনা, খুঁটিনাটি সুন্নাত পালনের দ্বারা মানুষ ইহসানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে বলে মনে করা হয়।

سرداد نداد دست در دست یزید

"মস্তক দিয়েছি, কিন্তু ইয়াজীদের হাতে হাত মিলাতে প্রস্তুত হইনি।"

এরূপ বিপ্লবী ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আত্মোৎসর্গীভাব কোন লোকের মধ্যেই ওঠেনি। এজন্যই—

بازی اگر چه پانه سکا سرتو کهو سکا

"জয়লাভ হয় তো করিনি, নিজের মস্তক তো উৎসর্গ করতে পেরেছি।" বলে নিজেকে সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পারিনি।

দুনিয়ার বৈষয়িক রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের মধ্যেও নিষ্ঠাবান, অনুগত এবং অবাধ্য কর্মচারীদের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে কিংবা দেশের কোন অংশের উপর শত্রুপক্ষের আধিপত্য স্থাপিত হলে তখন যারা বিদ্রোহ ও শত্রুদের এই অন্যায় পদক্ষেপকে সংগত বলে মনে করে, অথবা এতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাদের সাথে বিজিতের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে, কিংবা তাদের প্রভুত্বাধীন এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করে যার কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি শত্রুদের নিকট থাকবে, আর কিছু ছোটখাটো ব্যাপারের আবিষ্কার ও ক্ষমতা তারা নিজেরা লাভ করবে —কোন রাষ্ট্র কিংবা জাতিই এই শ্রেণীর লোকদেরকে অনুগত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। জাতীয় পোশাক ও বাহ্যিক চালচলন কঠোরভাবে অনুসরণ করে চললেও এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে জাতীয় আইন দৃঢ়তার সাথে পালন করে চললেও এর কোন মূল্যই দেয়া হয়

না, বর্তমান যুগের কত ঘটনাকেই এর উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জার্মানী বহু দেশ দখল করেছিল এবং সেই বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক লোকই তাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দেশগুলো যখন জার্মান প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করলো তখন জার্মান প্রভুত্বের সাথে সহযোগিতাকারীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব রাষ্ট্র ও জাতির নিকট নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার একটি মাত্র মাপকাঠি রয়েছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ—শত্রুপক্ষের প্রভুত্ব বিলুপ্তির জন্য কে কতখানি কাজ করেছে এবং যার প্রভুত্ব সে স্বীকার করে বলে দাবী করে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কে কতখানি চেষ্টা ও সাধনা করেছে—নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার এটাই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড।

দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোরই যখন এরূপ অবস্থা—সকল প্রকার আনুগত্যকে এই তীব্র শাণিত মানদণ্ডে যাচাই করে নেয়াই যখন এদের রীতি দুনিয়ার কমবুদ্ধির মানুষের ন্যায় নিজের নিষ্ঠাবান আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট কি কোন মানদণ্ড নেই? আল্লাহ তায়ালা কি শুধু শ্মশ্রুর দৈর্ঘ, লংগী-পায়জামার উর্ধস্থতা, তসবীহ পাঠ এবং দরূদ, অজীফা, নফল এবং মোরাকাবা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ-কর্ম দেখে প্রতারিত হবেন, আর নিজেরা খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাহ বলে মনে করবেন? আল্লাহ সম্পর্কে এত হীন ধারণা করা কি কোনরূপেই সমীচীন হতে পারে?

ভুল ধারণার অপনোদন

উপসংহারে কয়েকটি জরুরী কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। দীর্ঘকালের ভুল ধারণার কারণে সাধারণ মুসলমানের মনে খুঁটিনাটি কাজ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানসমূহের গুরুত্ববোধ তীব্র হয়ে রয়েছে। দ্বীন ইসলামের মূলনীতি ও সামগ্রিক তথ্য এবং দ্বীনদারী ও ইসলামী নৈতিকতার নিগূঢ় ভাবধারার দিকে অসংখ্যবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা এর গুরুত্ব অনুভব করতে পারে না। লোকদের মন-মস্তিষ্কে ঘুরে-ফিরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ ও সামান্য সামান্য বাহ্যানুষ্ঠানের গুরুত্বই তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের দৃষ্টি এত ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন কাজগুলোর অন্তরালে গভীর সত্য পর্যন্ত পৌছায় না, বস্তুত ছোট ছোট ও ক্ষুদ্র কাজগুলোকেই দ্বীন ইসলামের মূলভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। জামায়াতের

বহু সদস্য এবং সমর্থকদের উপরও এই ভুল ধারণার মারাত্মক প্রভাব থাকতে পারে। দ্বীন ইসলামের মূল তত্ত্ব ও প্রকৃত নিগূঢ় সত্য কি, তাতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব কোন জিনিসের এবং কোন্‌টি মুখ্য আর কোন্‌টি গৌণ—এসব কথা সঠিকরূপে বুঝাবার জন্য আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেকের মধ্যে সেই বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রিয়তা এবং মূলনীতি অপেক্ষা খুঁটিনাটি ব্যাপারে গুরুত্বদানের সংক্রামক ব্যাধি তাদেরকে জর্জরিত করে দিয়েছে। জামায়াতের লোকদের দাড়ির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার জন্য, পায়ের গিটের উপরে উঠিয়ে পায়জামা পরার জন্য এবং এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে চাপ দেয়ার জন্য আমাকে বারবার বলা হচ্ছে। কোন কোন লোক আবার 'জামায়াতে ইসলামীতে' 'মারেফাতের' অভাব অনুভব করছেন। কিন্তু মূলত মারেফাত কি জিনিস তারা নিজেরা হয়তো তা জানেন না। এজন্যই তারা আসল লক্ষ্য ও কর্মনীতি জামায়াতে ইসলামীরই ঠিক রেখে কোন খানকাহ হতে আত্মশুদ্ধি সাধন ও আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের কার্যসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাবও করছেন। এ দৃষ্টে মনে হয়, দ্বীন ইসলামের প্রকৃত ধারণা এদের মনে আদৌ বর্তমান নেই।

একটু পূর্বেই আমি ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের ব্যাখ্যা করেছি। এই ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বিপরীত কোন কথা যদি আমি বলে থাকি, তবে অকুণ্ঠভাবে এর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করুন। কিন্তু আপনি যদি স্বীকার করেন যে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী উক্ত চারটি জিনিসের মূলতত্ত্ব বর্ণিত রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়, তবে যেখানে ঈমান তার যাবতীয় ব্যাপকতা ও গভীরতা সহকারে ফুটে ওঠেনি এবং যেখানে তাকওয়া ও ইহসানের মূল শিকড়ই বর্তমান নেই সেখানে কোন প্রকারেই 'মারেফাত' (আধ্যাত্মিকতা) সন্ধান করে পাওয়া যেতে পারে না, তা আপনাদের নিজেদেরই চিন্তা করা উচিত। আর যেসব খুঁটিনাটি ও গৌণ বিষয়কে দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী বলে আপনারা ধরে নিয়েছেন সেগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব পুনরায় আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমি এই দিক দিয়ে আমার সমগ্র দায়িত্বই পূর্ণরূপে পালন করতে চাই।

সর্বপ্রথম শান্ত মনে এই প্রশ্নের জবাব নির্ধারণ করুন যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে নবী কেন প্রেরণ করেন ? দুনিয়াতে কোন্‌ বস্তুর অভাব রয়েছে, এখানে কোন্‌ ত্রুটি ও দোষ রয়ে গিয়েছিল, যা দূরিভূত করার জন্য আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। দুনিয়ার অধিবাসীগণ দাড়ি রাখত-

না, তা রাখার জন্য কি আল্লাহ্ তায়ালা নবী পাঠিয়েছেন ? কিংবা সব লোক পায়ের তালু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করত বলে এটা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবী পাঠিয়েছেন ? অথবা যেসব 'সুন্নাত' দেশময় প্রচলিত করার জন্য আপনারা ব্যস্ত হয়েছেন, তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত করার জন্যই দুনিয়াতে নবীর আবির্ভাব অপরিহার্য হয়েছিল ? এসব প্রশ্ন সম্পর্কে একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, বস্তুত এটা কোন মৌলিক দোষ-ত্রুটি নয়, নবী আগমনেরও এটা মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে কোন্ মূল দোষ-ত্রুটির জন্য নবী আগমনের প্রয়োজনীয়তা হয়েছিল ? এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হতে পারে এবং তা এই যে, আল্লাহর দাসত্ব বিমুখতা, ধর্মহীনতা, আল্লাহর আনুগত্য করে চলার প্রতি উপেক্ষা, নিজেদের মনগড়া নিয়ম-বিধানের অনুসরণ এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাস—এগুলোই ছিল দুনিয়ার মূলগত দোষ-ত্রুটি। এ কারণেই মানুষের নৈতিক চরিত্রে চরম ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। জীবনযাপনের জন্য ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রচলন হয়েছিল, গোটা পৃথিবী চরম ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিল। বস্তুত মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যই দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছিলেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন এবং সুষ্ঠু মূলনীতির ভিত্তিতে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা, মঙ্গল ও কল্যাণের স্বতস্ফূর্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত করা এবং অন্যায় ও পাপের সকল উৎস বন্ধ করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। বস্তুত দুনিয়াতে নবীদের আগমনের এটাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সর্বশেষ এই বিরাট মহান উদ্দেশ্যের জন্যই এসেছিলেন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

এখন নবী করীমের (সা) কর্মনীতি ও পদ্ধতি যাচাই করে দেখতে হবে, দেখতে হবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি কোন্ ক্রমিক ও পর্যায়মূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সকলেই জানেন, সর্বপ্রথম তিনি ঈমানের দাওয়াত পেশ করেছেন। অতপর এই ঈমানের অনিবার্য দাবী ও পরিণতি অনুযায়ী ক্রমশ শিক্ষা-দীক্ষাদানের সাহায্যে ঈমানদার লোকদের মধ্যে বাস্তব আনুগত্য অনুসরণ (অর্থাৎ ইসলাম), নৈতিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা (অর্থাৎ তাকওয়া এবং আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম নিষ্ঠা (অর্থাৎ ইহসান ইত্যাদি) গুণবলী ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপরই এই নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের সংগঠিত চেষ্টা

ও সাধনার সাহায্যে প্রাচীন জাহেলী যুগের অস্বাভাবিক ও ক্ষয়িষ্ণু জীবন-ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে আল্লাহর বিধানের নৈতিক ও তামাদ্দুনিক মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে এক নির্মল সুষ্ঠু ও সত্যতাপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে এসব লোকই যখন নিজেদের মন, মস্তিষ্ক, নৈতিক চরিত্র, চিন্তাধারা ও কাজ-কর্ম—সকল দিক দিয়েই প্রকৃত মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিন হলো এবং আল্লাহ খাঁটি নিষ্ঠাবান বান্দাহদের প্রকৃতিই যে কর্তব্য পালন করা উচিত তাতে নিযুক্ত হলো তারপরই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, কাটছাঁট পোশাক পরিচ্ছদ, উঠাবসা, চলাফিরা এবং এভাবে অন্যান্য বাহ্যিক কাজ-কর্মসমূহের মধ্যে মুত্তাকীদের শোভাবর্ধক ভদ্রতামূলক নিয়মনীতির শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। অন্য কথায় সর্বপ্রথম তিনি কাঁচা তামাকে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করেছেন, তারপর তার 'আশরাফীর' (আরবীয় স্বর্ণ মুদ্রা) ছাঁচ বা নকশা অংকিত করেছেন। প্রথমে খাঁটি যোদ্ধা ও বীর সৈনিক তৈয়ার করেছেন, তারপরই তাকে পোশাক পরতে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন-হাদীসের গভীর ও সূক্ষ্ম অধ্যয়ন করার পর নিসন্দেহে জানা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের এটাই একমাত্র সঠিক পন্থা—এটাই হচ্ছে এ কাজের পর্যায়মূলক ক্রমিক ধারা। নবী করীম (সা) আল্লাহ তায়ালার মর্জি অনুযায়ী যে পন্থায় কাজ করেছিলেন সেই পন্থা অনুসরণকেই যদি 'সুন্নাত' পালন মনে করা হয় তবে উক্ত কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করাই সুন্নাত বলতে হবে এবং এ জন্যই লোকদেরকে প্রকৃত মু'মিন, মুসলিম, মুত্তাকী মুহসীন এ পরিণত না করে তাদেরকে মুত্তাকীদের বাহ্যিক পোশাক ও চাল-চলন অনুসারী এবং মুহসীনদের কতকগুলো প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপ্রিয় কাজের অনুকরণকারী বানাতে চেষ্টা করা কোনক্রমেই 'সুন্নাত' হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এটা সুন্নাতের স্পষ্ট বিরোধিতা, 'সুন্নাতের' নামে মনগড়া নীতির প্রচার ; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা ঠিক সীসা ও তামা খণ্ডের উপর 'আশরাফীর নকশা অংকিত করে বাজারে চালাবার অপচেষ্টা এবং সৈনিকতা, নিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গীকৃত মনোভাব সৃষ্টি না করেই নিছক উর্দী পরা কৃত্রিম যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করানোর অনুরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ। আমার মতে এটা প্রকাশ্য জাল ও প্রতারণামূলক কৃত্রিমতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর বস্তুত পক্ষে এই জাল ও কৃত্রিমতার ফলেই বাজারেও যেমন এই কৃত্রিম মুদ্রার কোনই মূল্য নেই, যুদ্ধক্ষেত্রেও এই কৃত্রিম ও প্রদর্শনীমূলক সৈনিক দ্বারা কোন কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করাও মাত্রই সম্ভব হচ্ছে না।

বস্তুত আল্লাহর নিকট যে কোন্ বস্তুটির প্রকৃত মূল্য কি হবে তাও চিন্তা করে দেখতে হবে। মনে করুন ঃ এক ব্যক্তির অকৃত্রিম ঈমান আছে, কর্তব্যজ্ঞান

আছে, উন্নত নির্মল চরিত্রের গুণে সে গুণান্বিত, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করে চলে, আল্লাহর আনুগত্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ; কিন্তু বাহ্যিক বেশ-ভূষার দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ এবং বাহ্যিক সভ্যতার মানদণ্ডে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এটাকে খুববেশী খারাপ বললেও শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, "চাকরটি আসলে ভাল, কিন্তু একটু অসভ্য —এই যা।" তার এই 'অসভ্যতা'র দরুন হয়তো সে উচ্চতম মর্যাদা লাভ করেত পারবে না। কিন্তু শুধু এতটুকু অপরাধের দরুনই কি তার সকল নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিষ্ফল হয়ে যাবে ? এবং কেবল উত্তম বেশ-ভূষায় সম্পন্ন না হওয়ার অপরাধেই তার মনিব তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে ? এটাকি কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় ? মনে করুন ঃ অন্য এক ব্যক্তির কথা, সে সবসময়ই শরীয়তী পোশাক পরিধান করে থাকে এবং সভ্যতার আচার অনুষ্ঠান ও আদব-কায়দা যারপরনাই সতর্কতা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করে চলে, কিন্তু তার নিষ্ঠা ও আনুগত্যের বিশেষ অভাব রয়েছে তার কর্তব্যজ্ঞান জাগ্রত নয়, তার ঈমানী মর্যাদাবোধেও তেজস্বী নয় এমতাবস্থায় তার এই আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটির বর্তমানে আল্লাহর নিকট তার বাহ্যিক বেশ-ভূষার কতখানি মূল্য হতে পারে ? বস্তুত এটা জটিল ও গভীর আইনগত ব্যাপার নয়, যা বুঝার জন্য বড় বড় কিতাব সন্ধান করে বেড়াতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই বুঝতে পারে, এ দু'টি জিনিসের মধ্যে প্রকৃত মর্যাদা কোন্‌টি হতে পারে ? দুনিয়ার কম বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যেও একটা জ্ঞান থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি সম্মান পাওয়ার যোগ্য, আর যেটির সৌন্দর্য মৌলিক নয়—এই দু'টির মধ্যে তারাও পার্থক্য করতে পারে। ভারতের অধুনালুপ্ত ইংরেজ সরকার এই ব্যাপারে একটি চমৎকার উদাহরণ। এরা যে কত বাবু ও ফেশনপ্রিয় এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য এরা যে কত প্রাণ দিয়ে থাকে তা সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাদের নিকট প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা কোন জিনিসটি পেয়ে থাকে, তা ভেবে দেখেছেন কি ? যে সামরিক কর্মচারী তাদের রাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য নিজের মন, মস্তিষ্ক ও দেহ-প্রাণের সকল শক্তি ব্যয় করতো এবং আসল সংকট সময়ে সে জন্য কোনরূপ আত্মদানে কুণ্ঠিত হতো না, ঠিক তাকেই তার মর্যাদা দান করতো উচ্চতম পদে তাকেই অভিষিক্ত করতো। বাহ্য দৃষ্টিতে সে শত অসভ্য গোঁয়ার, অমুণ্ডিতশ্মশ্রু বিশিষ্ট, বেকায়দায় পোশাক পরিহিত পানাহারে অনিয়মিত ও কৃতকার্যে অপটু হোক না কেন, তাতে তার পদোন্নতির কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হতো না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয়, সভ্যতা এবং সমাজের সর্বজনপ্রিয় রীতিনীতিগুলোর

পূর্ণমাত্রায় অনুসরণকারী কিন্তু আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে পশ্চাদপদ এবং আসল কাজের সময় নিজের সুযোগ-সুবিধাগুলোর প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখে, ইংরেজগণ তাকে কোন সম্মানিত পদ দেয়া তো দূরের কথা, তাকে কোর্ট মার্শাল করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। দুনিয়ার সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের যখন এরূপ অবস্থা তখন আল্লাহ সম্পর্কে কি ধারণা করা যায় ? তিনি স্বর্ণ ও তামার পার্থক্য না করে শুধু বাহ্যিক নকশা ছাঁচ দেখে এতে স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য দান করবেন ? আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কি কোন মতেই সমীচীন হতে পারে ?

আমি আবার বলব, আমার একথা হতে মনে করবেন না যে, আমি মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে চাচ্ছি, কিংবা মানব জীবনের বাহ্যিক দিকসমূহের সংশোধন ও সুষ্ঠুতা বিধানের জন্য প্রবর্তিত বিধি-নিষেধসমূহ পালন করা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করতে চাচ্ছি—এটা মাত্রই সত্য নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রত্যেকটি হুকুমই যথাযথ ভাবে পালন করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। আর দ্বীন ইসলাম মানুষের আভ্যন্তরীণ ও রাহ্যিক—উভয় দিককেই সুন্দর ও সুষ্ঠু করে গঠন করতে চায়, তাও আমি পূর্ণরূপে স্বীকার করি কিন্তু এটা সত্ত্বেও আমি শুধু একথাই আপনাদের বুঝাতে চেষ্টা করছি যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ দিকই মূখ্য ও সংস্কারযোগ্য—বাহ্যিক দিক সেরূপ নয়। প্রথমে মানুষের মূল সত্যের মণিমঞ্জুষা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে তারপর এই আভ্যন্তরীণ দিক অনুসারেই তার বাহ্যিক দিককেও গঠন করতে হবে। আল্লাহর নিকট যেসব গুণের প্রকৃত মূল্য রয়েছে এবং যে গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন ও ক্রমবিকাশ দানই ছিল আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্বপ্রথম সেগুলোর দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে এবং সর্বাগ্রে তা অর্জন করতে হবে। পরন্তু বাহ্যিক দিকের সংস্কার প্রথমত উক্ত গুণাবলীর অনিবার্য পরিণাম স্বভাবতই সম্পন্ন হবে তার পরও কোন অসম্পূর্ণতা থাকলে ক্রমিক অধ্যায়সমূহ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণতা লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি এই দীর্ঘ বক্তৃতা আপনাদের সামনে করলাম শুধু এ জন্যই যে, প্রকৃত সত্য কথা পরিপূর্ণতা ও ব্যাপকতার সাথে আপনাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে পেশ করে আল্লাহর নিকট আমি সকল দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভ করতে চাই। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই কার আয়ু কখন শেষ সীমান্তে এসে পৌছবে, তা কেউ জানে না, কেউ বলতেও পারে না।

এজন্য সত্যের বাণী পৌঁছাবার যতখানি দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে পৌঁছাতে চাই। এখনো কোন কথা অস্পষ্ট বা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ থেকে গেলে জিজ্ঞেস করে নিন এবং সত্যের বিপরীত কোন কথা আমি বলে থাকলে আপনারা তার প্রতিবাদ করুন। আর প্রকৃত সত্য কথা যথাযথভাবে আপনাদের নিকট যদি আমি পৌঁছিয়ে থাকি, তবে আপনারা তার সাক্ষ্য দিন। (সভাস্থল হতে ধ্বনি উঠলো ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি) —আমার এই দায়িত্ব পালনের আপনারাও সাক্ষী থাকুন আল্লাহও যেন সাক্ষী থাকেন। আমি দোয়া করছি। আল্লাহ্ আপনাদেরকে ও আমাকে দ্বীন ইসলামের নিগূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করার তওফীক দিন এবং জ্ঞান অনুযায়ী দ্বীন ইসলামের সমগ্র দাবী পূরণের তদনুযায়ী জীবন ও যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষমতাও দান করুন। আমীন।